যন্ত্রপাতি ছাড়াই রোগ নির্ণয়।   ঔষধ ছাড়াই রোগ নিরাময়।

স্বচিকিৎসা প্রয়োগবিধি

(আকুপ্রেশার চিকিৎসা পদ্ধতির নিয়মকানুন)
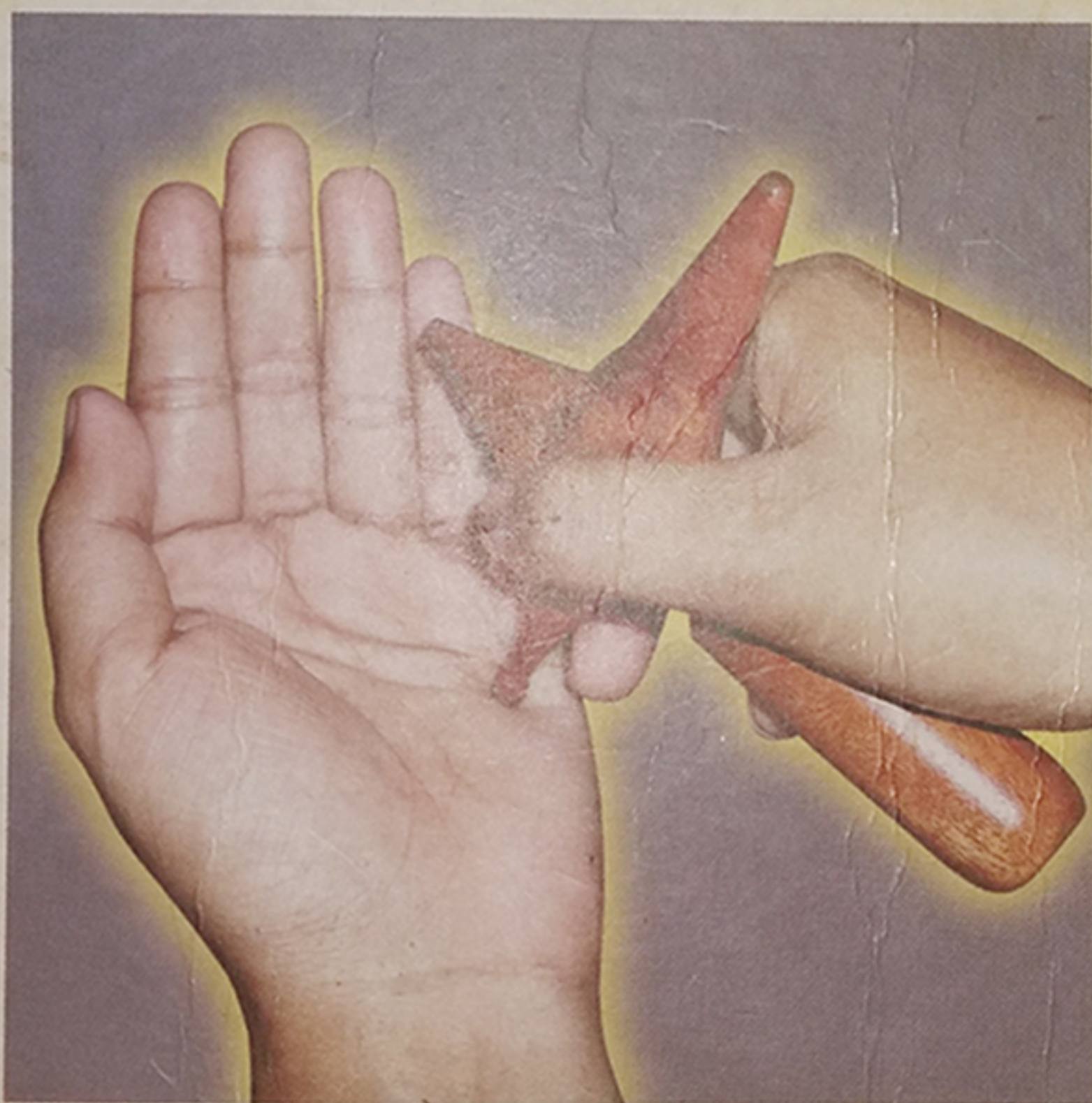
সাগর সগীর

স্বচিকিৎসা প্রয়োগবিধি

(আকুপ্রেশার চিকিৎসা পদ্ধতির নিয়মকানুন)

সাগর সগীর

সোসাইটি ফর

বঙ্গজ স্বচিকিৎসা পরিবার

২৮১, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

ফোন : ০১৯৪৩২৩৫৬২১, ০১৭১৭ ৮৩২৯৫১

e-mail: sagarsagir1962@gmail.com, oindrila8027@gmail.com

web : www.sagarsagir.com

উৎসর্গ

প্রীতিভাজনেষু
সহধর্মীনী
ঐন্দ্রিলা আক্তার সগীর
বাংলাদেশে আকুপ্রেশার প্রসারে
যার অসাধারণ ভূমিকার কথা
মনে রাখবে
প্রজন্মের পর প্রজন্ম ।

এই সংস্করণের প্রতিটি বই
তাঁরই সৌজন্যে ।

স্বচিকিৎসা প্রয়োগবিধি

(আকুপ্রেশার চিকিৎসা পদ্ধতির নিয়মকানুন)

গ্রন্থকার : সাগর সগীর

প্রকাশক : বঙ্গজ প্রকাশনী

গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী-২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে-২০১১
তৃতীয় প্রকাশ : নম্বেভর-২১১
চতুর্থ প্রকাশ : জানুয়ারি -২০১৩
অলংকরণ : মিলন
মুদ্রণ : মাটি আর মানুষ
মূল্য : ২৫০.০০ (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩০৮৬-৪

Shachikitsha Proyugbidhi (Acupressure User Manual)
by Sagar Sagir, Published in January 2011, by Bongojo Prokashoni,
281, Donia, Jatrabari, Dhaka
mail: sagarsagir1962@gmail.com

২৮১, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ফোন : ০১৯৪৩২৩৫৬২১, ০১৭১৭ ৮৩২৯৫১

ভূমিকা

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

বিংশ শতাব্দী রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বলা যায় একটা বৈপ্লবিক যুগ। রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। রেডিওলজী, ইমেজিং, আল্ট্রাসনোগ্রাফী ইত্যাদি রোগ নির্ণয়কে সহজতর করলেও সকল রোগের চিকিৎসা পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে বলা যায় না। অনেক রোগ আছে যার চিকিৎসা সাময়িক। কষ্টদায়ক লক্ষণের কিছু পরিবর্তন আনতে পারলেও রোগমুক্তি সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। চিকিৎসার খরচ, দামী ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে গরীব রোগীর হাতে ঔষধ কেনার পয়সা থাকে না- চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হয়।

প্রয়োজনের খাতিরে যুগ যুগ ধরে বিকল্প চিকিৎসার কথা ভেবে আসলেও বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিকল্প চিকিৎসা ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করে। এই বিকল্প চিকিৎসা পেয়ে একে আধুনিক চিকিৎসার সম্পূরক হিসেবে স্থান দিতে অনেকের আপত্তি নেই। আধুনিক চিকিৎসকও বিকল্প চিকিৎসাকে এখন আর অবজ্ঞার চোখে দেখেন না। বরং স্বচ্ছন্দে এর প্রয়োগে আকৃষ্ট হন।

কিছুকাল আগেও পশ্চিম গোলার্ধে আকুপাংচার সম্পর্কে নানা বিদ্রুপ হত। পাগলামী আখ্যা না দিলেও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে তারা দ্বিধা করত না। সময়ের ব্যবধানে এ পদ্ধতি এখন সম্মানের আসনে। পশ্চিমা দেশগুলোতে আকুপাংচার-এর উপর চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, এমনকি ডিগ্রীও প্রদান করা হয়।

কালের গতিতে আকুপাংচারের বিস্তৃতির সাথে সাথে এর সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছে। আকুপাংচারকে যদি একটি ইনজেকশনের সাথে তুলনা করা হয় এর বিপদসীমাও অনুরূপ। এই ইনজেকশনের ফলে অনেক রোগের বিস্তৃতি ঘটে।

বর্তমান শতাব্দীর চিকিৎসা জগতের বড় চ্যালেঞ্জ এইচআইভি বা এইডস এই সুঁই ফোটানোর মধ্য দিয়েই বিস্তার লাভ করে। ভাইরাস দ্বারা হেপাটাইটিস বি এবং সি বিস্তার লাভ করে একই প্রক্রিয়ায়। অথচ এসমস্ত রোগের সফল চিকিৎসা এখনও আমাদের আয়ত্বের বাইরে।
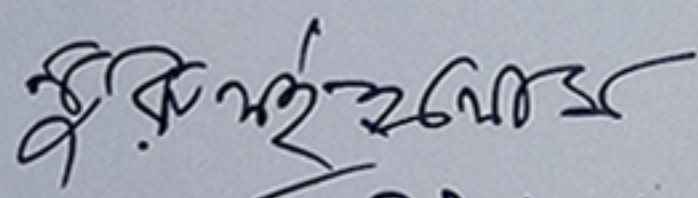
কথায় বলে, বিপদ মানুষকে সতর্ক করে; সতর্কতা সাফল্য আনে। মানুষ নতুন পথের সন্ধানে এগিয়ে চলে। ফলে এক সময় নতুন পথের সন্ধান মেলে। একইভাবে ইনজেকশনের মত আকুপাংচারের বিপদ মানবকল্যাণে নিবেদিত বৈজ্ঞানিকদের নতুন পথ দেখিয়েছে। আকুপ্রেশার হচ্ছে এই নতুন পথ।

এখন আর ইনজেকশন নিতে হয় না। দেখা গেছে ইনজেকশন না দিয়ে চিকন সিরিঞ্জেরই মতো ভোঁতা কিছু দিয়ে ছিদ্রবিহীন একই পয়েন্টে চাপ সৃষ্টি করলে একই ফল পাওয়া যায়। এটা সকলের জন্য সুফলদায়ক। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটা রোগী সামান্য নির্দেশনা নিয়ে সঠিকভাবে নিজের চিকিৎসা নিজেই করতে পারে। এজন্য দরকার শুধু জানার সদিচ্ছা।

নিজের চিকিৎসা নিজে করলে অপব্যয় থেকে মুক্তি। অপব্যয় এবং পারিবারিক আর্থিক বোঝা থেকে মুক্তি। এখানে আর্থিক দিক দিয়ে গরীবের উপর বোঝা বাড়ার ফলে তাদেরকে আর চিকিৎসা বন্ধ করতে হয় না। সুঁই ফোটানোর বিপদ থেকে রোগ বিস্তৃতির সম্ভাবনা থাকে না; অথচ রোগমুক্তি হয় প্রায় সমানভাবেই।

সার্বিক বিচারে আকুপ্রেশারকে স্বচিকিৎসা বলা হয়। নামটি শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং অতি যুক্তিসঙ্গত। এবং আমি মনে করি বিজ্ঞানসম্মত কারণে এটি একটি গ্রহণযোগ্য নাম। এমন একটি উন্নতমানের চিকিৎসা ঘরে বসে নিজে নিজে করতে পারলে আর্থিক কারণে এটা বলা যেতে পারে শুধু স্বচিকিৎসা নয় গরীবের চিকিৎসা।

সহজ সরল ভাষায় এর উপর পুস্তক প্রকাশ করে ছবির মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিয়ে গ্রন্থকার, বাংলাদেশে আকুপ্রেশার চিকিৎসার পথিকৃৎ সাংবাদিক সাগর সগীর একটি নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন। এটি জনগণের কল্যাণে বিপুল অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এর বহুল প্রচার কামনা করি। জরাগ্রস্ত রোগীরা এই পথ ধরে নিজেদের সুস্থ করে তুলবেন এই আশা প্রকাশ করি। সকলের মঙ্গল হোক; স্বচিকিৎসা লাভে সুখী এবং সুস্থ হোক এটাই প্রত্যাশা এবং এই প্রত্যাশা হোক আমার আপনার সকলের।

২৯/২/২০১৬

প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম
এমবি (কলকাতা), টিডিডি (ওয়েলস),
ডিএসসি (স), এফএএস, পিএইচডি
এফসিপিএস (পাক) এফসিসিপি (আমেরিকা),
এফআরসিপি (এডিন), এফআরসিপি (লন্ডন),
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড
টেকনোলজী চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি),
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডা. বিধান রায় পুরস্কার
এবং 'শিক্ষা ও চিকিৎসা-রত্ন' উপাধি প্রাপ্ত
জাতীয় অধ্যাপক, বাংলাদেশ।

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

পরিচ্ছেদ -১

আকুপ্রেশার পরিচয় পর্ব

পরিচ্ছেদ সূচি

১. আকুপ্রেশার কি?

আকুপ্রেশার হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মূলত কোন প্রকার ঔষধ ছাড়াই শরীরের নির্দিষ্ট কিছু বিন্দুতে নির্দিষ্ট নিয়মে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে রোগ নিরাময় করা যায়। বাংলাদেশে আকুপ্রেশারের আরেক পরিচিতি রয়েছে স্বচিকিৎসা নামে।

২. আকুপাংচার ও আকুপ্রেশার এর মধ্যে পার্থক্য কি?

আকুপাংচার পদ্ধতিতে শরীরের নির্দিষ্ট বিন্দুতে ধাতু নির্মিত সূঁচ ফুটিয়ে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করা হয় যার মধ্য দিয়ে শরীরের রোগ ব্যাধির উপশম হয়। ল্যাটিন শব্দ অ্যাকিউস (Acus) অর্থ সূঁচ আর পাংচুরা (Punctura) কথাটির অর্থ ফুটানো।
অন্যদিকে আকুপ্রেশার পদ্ধতিতে সূঁচ ফুটানোর পরিবর্তে শরীরের একই বিন্দুগুলোতে চাপ দিয়েও রোগ নিরাময়ে সুফল পাওয়া যায়।

চিত্রে আকুপাংচার (চিত্র - ০১)
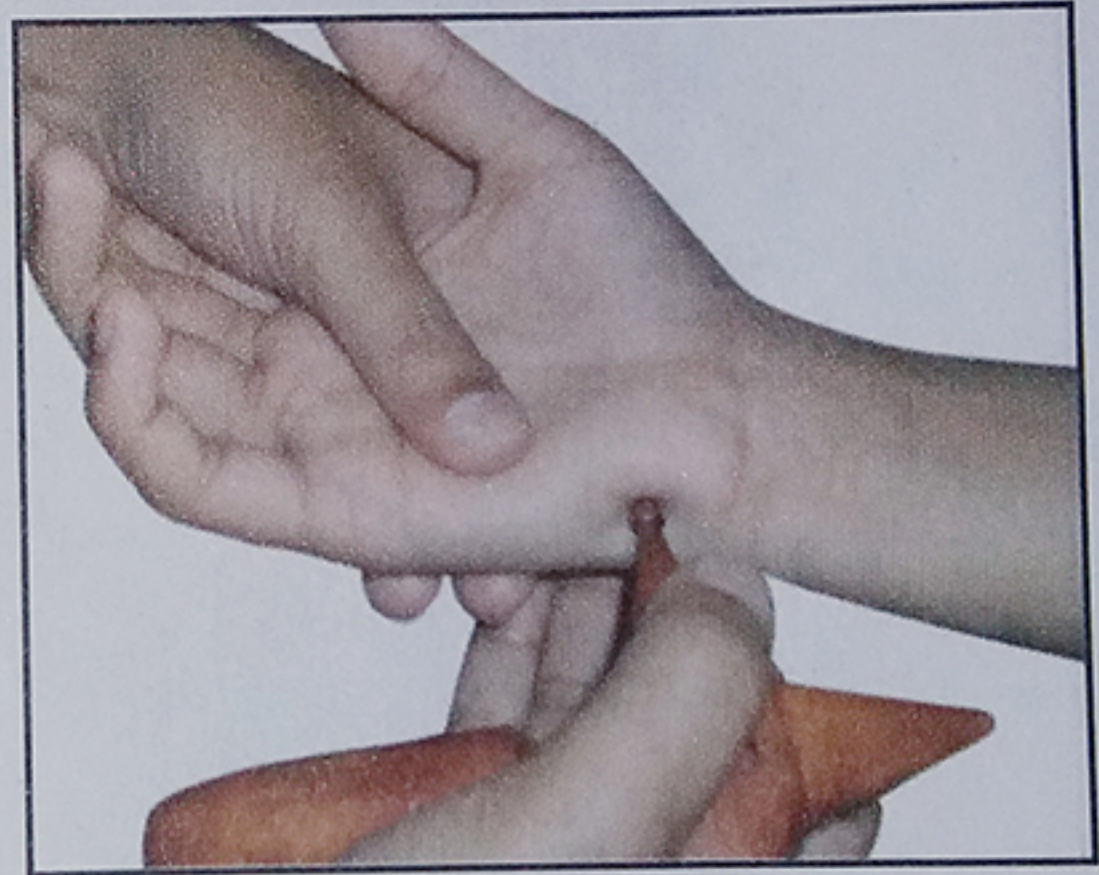
চিত্রে আকুপ্রেশার (চিত্র - ০২)

শব্দের অর্থগতভাবে আকুপ্রেশার শব্দমূলে অ্যাকিউস (অপঁং) শব্দটি রয়েছে; কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সূঁচ নয়, আঙ্গুল বা ভোঁতা কাঠি জাতীয় কোন কিছু দিয়ে এই চাপ প্রয়োগ করা হয়।
সাধারণভাবে মানব দেহে আকুপ্রেশার এবং আকুপাংচার এর প্রয়োগ বিন্দুগুলো এক এবং অভিন্ন। আকুপাংচার নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে, বলা যায় এ নিয়ে সাধনা করতে গিয়ে একসময় গবেষকগণ বিস্ময়ের সাথে এক নতুন আবিষ্কারের মুখোমুখি হলেন।
তারা লক্ষ্য করলেন আকুপাংচারের যে বিন্দুতে সূঁচ ফুটালে রোগ নিরাময় হয় সেই একই বিন্দুতে সূঁচের পরিবর্তে আঙ্গুল বা ভোঁতা কাঠি দিয়ে চাপ দিলেও একই বা কাছাকাছি সুফল পাওয়া যায়। ফলে আকুপাংচার পদ্ধতির সহজ উত্তরণ ঘটে আকুপ্রেশার পদ্ধতি হিসাবে।

৩. রিফ্লেক্সোলজি কি?

রিফ্লেক্সোলজি হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের আকুপ্রেশার। আকুপাংচার-ভিত্তিক আকুপ্রেশারে রোগ নিরাময়ে সহায়ক বিন্দুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা দেহে – মাথা থেকে পা পর্যন্ত। রিফ্লেক্সোলজির একই বিন্দুগুলো সীমাবদ্ধ কেবল করতল ও পদতল এবং এই দুইয়ের সন্নিহিত কিছু অংশে।

রিফ্লেক্স (Reflex) শব্দটি বলতে সাধারণভাবে প্রতিবিম্বিত হওয়া, প্রতিফলন হওয়া বুঝায়। করতল বা পদতলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ দিলে এর প্রতিক্রিয়ায় শরীরের অপর একটি নির্দিষ্ট অংশে (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থি) গিয়ে পড়ে ঐ চাপের প্রতিফলন। আর এজন্যই এই পদ্ধতিটির নাম হয়েছে রিফ্লেক্সোলজি। এটি জোন থেরাপি (Zone therapy) হিসেবেও পরিচিত।
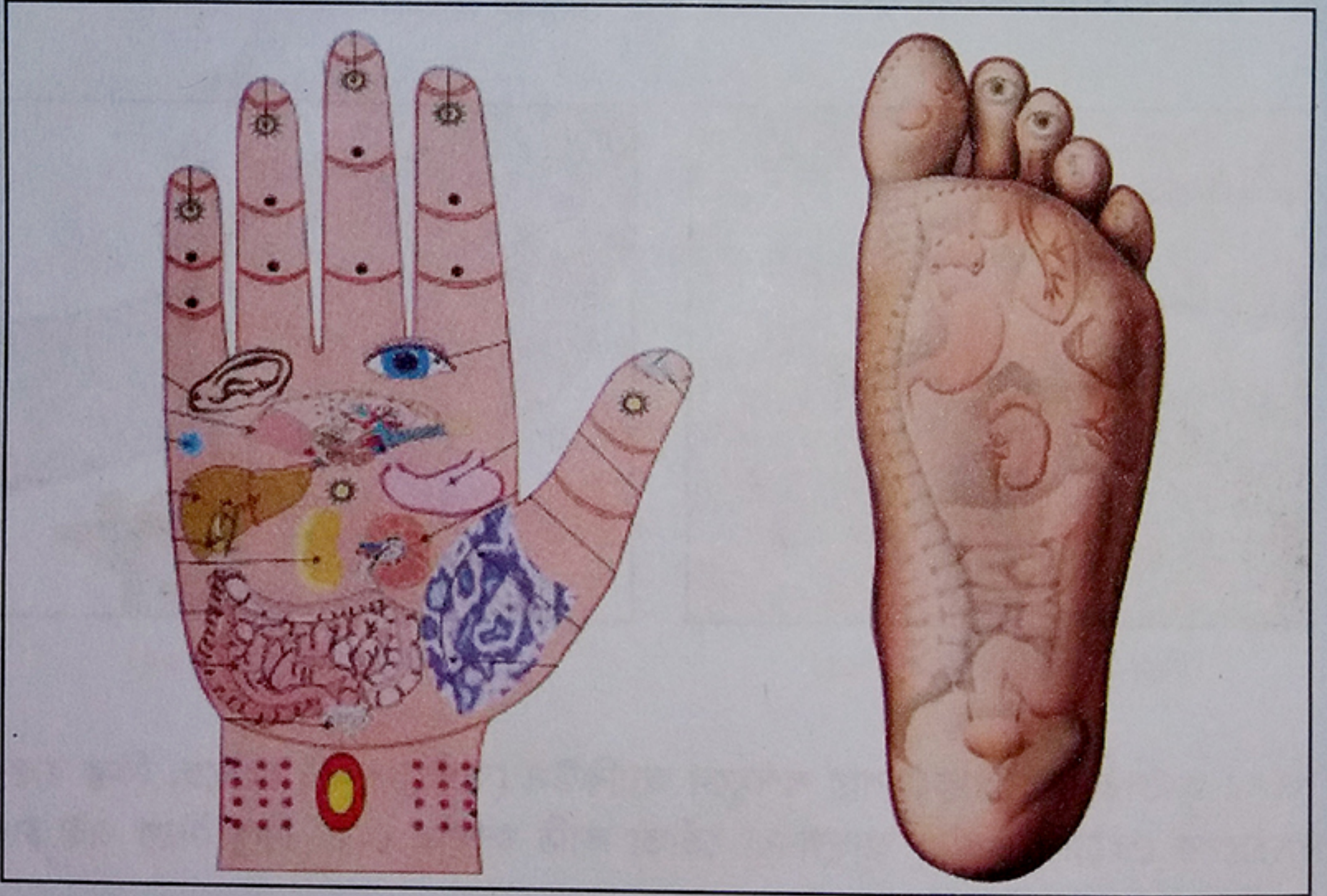
হাত-পায়ে রিফ্লেক্সোলজির চিত্র। (চিত্র - ০৩)

রিফ্লেক্সোলজি হচ্ছে আকুপ্রেশার পদ্ধতির একটি সহজ, সরল ও অগ্রসর রূপ। রিফ্লেক্সোলজি দ্বারা করতল আর পদতলের নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ দিয়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং গ্রন্থিগুলোতে সৃষ্ট সমস্যা দূর করা যায়।

তবে রিফ্লেক্সোলজি পদ্ধতিটি পরিচিত হয়ে উঠেছে যতটা না রিফ্লেক্সোলজি হিসেবে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আকুপ্রেশার হিসেবে। বাংলাদেশে এমনকি ভারতবর্ষে আকুপ্রেশার নামে যে চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়, মূলত তা রিফ্লেক্সোলজি,

বিশেষ করে বাংলাদেশে আকুপ্রেশার নামে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিও রিফ্লেক্সোলজি।

৪. আকুপ্রেশার ও রিফ্লেক্সোলজির পার্থক্য কি ?

রিফ্লেক্সোলজিও এক বিশেষ ধরনের আকুপ্রেশার। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রে আকুপাংচার ভিত্তিক আকুপ্রেশারের সাথে রিফ্লেক্সোলজি নামক আকুপ্রেশারে মূলত তিনটি পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমত, সাধারণ আকুপ্রেশারে রোগ নিরাময়ের বিন্দু বা সুইচগুলো রয়েছে গোটা দেহজুড়ে, আর রিফ্লেক্সোলজি নামক আকুপ্রেশারে রোগ নিরাময় বিন্দুগুলি রয়েছে কেবল করতল ও পদতল এবং এর সন্নিহিত কিছু অংশে।

(চিত্র - ০৪) (চিত্র - ০৫)
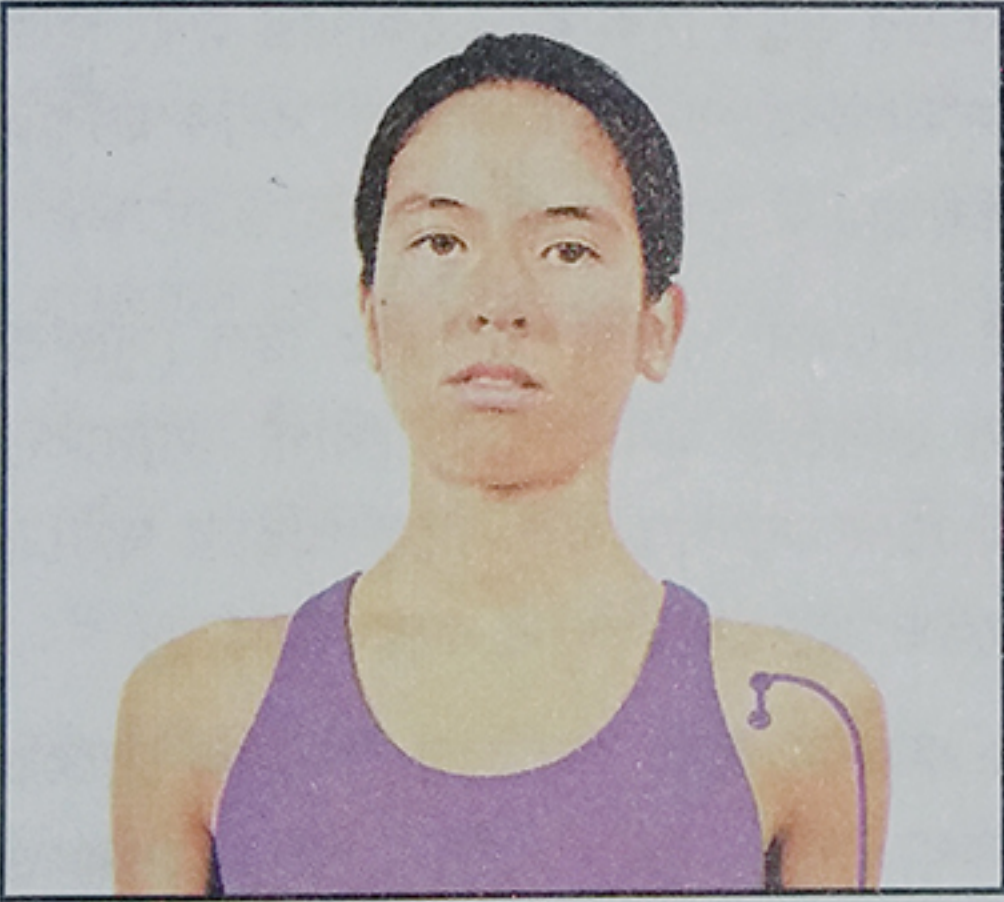
আকুপাংচার ও আকুপাংচার-ভিত্তিক আকুপ্রেশারে গলার সমস্যার বিন্দু।
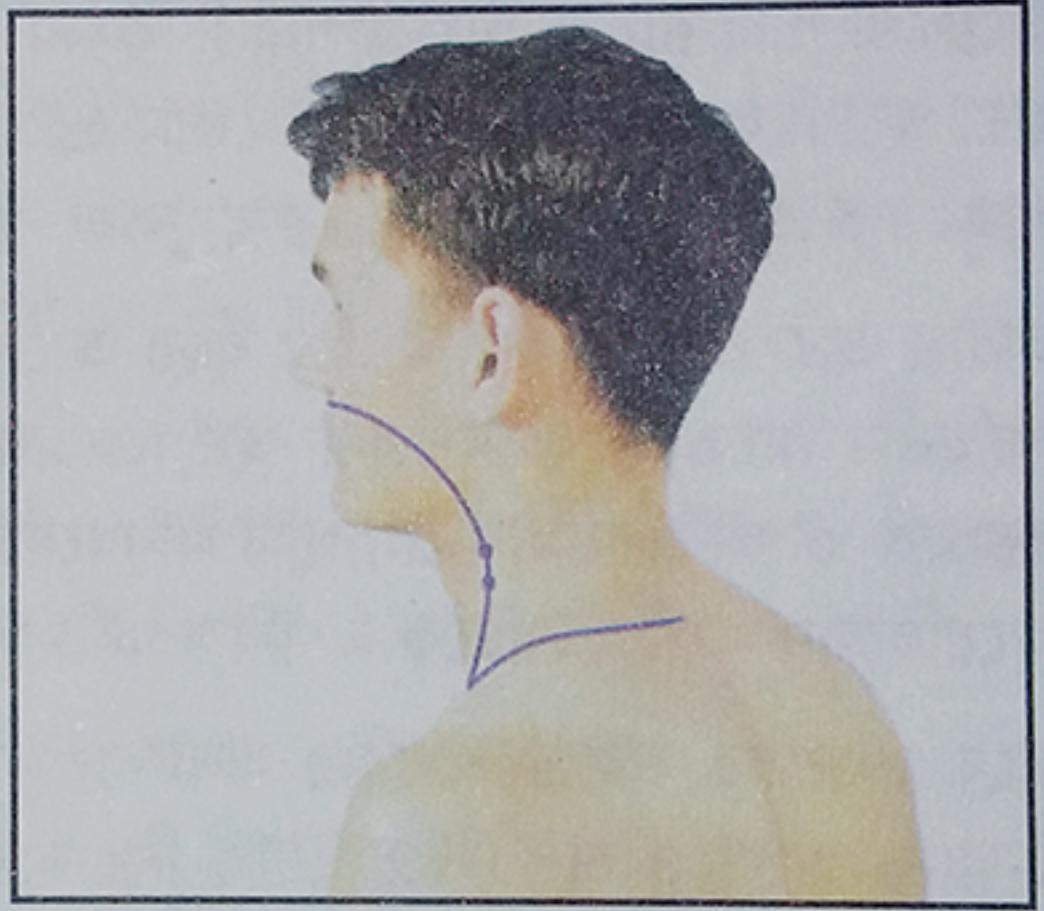
(চিত্র - ০৬) (চিত্র - ০৭)

রিফ্লেক্সোলজিতে হাতে ও পায়ে গলার সমস্যার বিন্দু।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাধারণ আকুপ্রেশারে গলার সমস্যার জন্য গলায় অবস্থিত যে বিন্দু গুলোতে চাপ দিয়ে সমস্যা দূর করতে হয়, গলার একই সমস্যা দূর করবার জন্য রিফ্লেক্সোলজিতে করতল এবং পদতলের নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ দিলেই উপশম সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ আকুপ্রেশারে রোগ নির্ণয় করা যায় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা করা গেলেও তা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু রিফ্লেক্সোলজিতে রোগ নির্ণয় করা যায় অতি সহজে, নির্ভুলভাবে এবং তা রোগের একেবারেই প্রারম্ভিক অবস্থায়।

তৃতীয়ত, রিফ্লেক্সোলজিতে সহজভাবে রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব, যা সাধারণ আকুপ্রেশারে বলা যায় বেশ কঠিন।

৫. রিফ্লেক্সোলজির উদ্ভব ও পটভূমি

রিফ্লেক্সোলজি নামক আকুপ্রেশার চিকিৎসা পদ্ধতিটির উদ্ভব ঠিক কবে কোথায় এবং কার দ্বারা হয়েছিল তার ধারাবাহিক কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে বিস্ময়কর প্রাকৃতিক এই চিকিৎসা পদ্ধতির যাদুকরী কার্যকারিতার উল্লেখ পাওয়া যায় ইতিহাসে।

প্রাচীন ভারতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল (সুশ্রুত সংহিতার মতে)। ধারণা করা হয়, প্রাচীনকালে ভারতীয় মুনী, ঋষি, যোগী, সন্ন্যাসী, দরবেশ ও আউলিয়াগণ রোগগ্রস্ত মানুষদের এই চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে এটিকে ঐশ্বরিক চিকিৎসা বলেও অনেকে বিশ্বাস করে থাকেন।

তবে ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও করতল এবং পদতলে এমনকি দেহের অন্যান্য অংশেও চাপ দিয়ে রোগ নিরাময়ের কথা জানা যায়। প্রাচীন চীন, মিশর ও উত্তর আমেরিকায় খ্রিষ্টের জন্মেরও দু'আড়াই হাজার বছর আগে এই চিকিৎসা পদ্ধতি চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে জোন থেরাপির উপর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। এর একটি লিখেছিলেন চিকিৎসাবিদ এ্যাডমাস এবং এটাটিস। এর কিছুদিন পর ডাঃ বেল নামক একজন চিকিৎসাবিদ জার্মানীর লাইপজিস নামক স্থান থেকে এর উপর আরেকটি বই প্রকাশ করেন।

রিফ্লেক্সোলজি নামে পরিচিত এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিকে আজকের পৃথিবীর সঙ্গে পুনঃপরিচয় করিয়ে দেওয়ার মূল কৃতিত্বের দাবিদার ডাঃ উইলিয়াম ফিটসজেরাল্ড (১৮৭২)। প্রখ্যাত এই চিকিৎসাবিদ ১৮৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনা থেকে মেডিসিনে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। ভিয়েনা, প্যারিস ও লন্ডনে বিভিন্ন হাসপাতালে প্র্যাকটিস করার সময় রোগীদের উপর এই পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি এর অব্যর্থ কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেন।

প্রাচীন কালে রিফ্লেক্সোলজির দুর্লভ প্রয়োগ-চিত্র। (চিত্র - ০৮)

সুদীর্ঘ গবেষণার পর ডাঃ ফিটসজেরাল্ড তার অপর সহকর্মী ডাঃ এডউইন বাওয়ার্ডসকে নিয়ে রিফ্লেক্সোলজির উপর 'জোন থেরাপি' নামে একটি বই রচনা করেন। তিনি মেডিকেল শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই পদ্ধতির উপর কোর্সও পরিচালনা করেন।

এই কোর্সে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক দম্পতি যোসেফ শেলী রিলে ও তার স্ত্রী এই পদ্ধতি প্রসারে উদ্যোগী হন। এই দম্পতির চিকিৎসা সহকর্মী ইউনিস ইনহাম (১৮৭৯-১৯৭৪) রিফ্লেক্সোলজি গবেষণা ও প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

এর উপর তিনি সাড়া জাগানো দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম -"Stories the Feet Can Tell/ Have Told Thru Reflexolog" মিসেস ইউনিস ইনহাম এর ছাত্রী ডরিন বেইলী বিগত শতকের ষাটের দশকের গোড়ায় ব্রিটেনে রিফ্লেক্সোলজির সূচনা করেন।

৬. কেন এই পদ্ধতির নাম স্বচিকিৎসা?

রোগ বাসা বাঁধে 'আমার' দেহে। রোগে ভুগতে হয় 'আমাকে'। সাথে কষ্ট আর বিড়ম্বনার শিকার হয় 'আমার' কাছের মানুষ। আবার অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় দেখা যায় রোগের উৎপত্তির, রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণও 'আমি'।

'আমার' স্বাস্থ্য অসচেতনতা, 'আমার' অসতর্কতা, 'আমার' অবহেলা, 'আমার' অমিতব্যয়িতা বা 'আমার' অপরিমিতিবোধ, 'আমার' অসংযম, 'আমার' নিয়ন্ত্রণ-অক্ষমতা, সর্বোপরি 'আমার' ভুল আর অজ্ঞতার ফসল 'আমার' রোগ!

ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের উপায় ও নিরোগ থাকার পথ রাখা আছে তাই 'আমারই হাতে'। এই পদ্ধতিতে নিশ্চিত ও কার্যকর এবং স্থায়ী সুফল লাভের মূল চাবিকাঠিই হচ্ছে 'নিজের চিকিৎসা নিজে করা'।

এই পদ্ধতিতে দ্রুত এবং সহজেই নিখরচায় পূর্ণ সুস্থতা লাভ করা যায় অথবা সম্ভব হয়ে থাকে চিকিৎসার প্রয়োগটি নিজে-নিজে করলে। রোগ সংশ্লিষ্ট বিন্দুগুলোতে দিনে নিয়মানুযায়ী একবার চাপ দিলে সুফল পাওয়া যায় ধীরে, দুই বার চাপ প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত দ্রুত সুফল পাওয়া যায় এবং তিনবার চাপ প্রয়োগে সুফল মেলে তার চেয়েও দ্রুত।

বলা বাহুল্য, দিনে ৩ বার, নিদেনপক্ষে ২ বার ও প্রতিবার এক থেকে দেড় ঘন্টা অন্যের (থেরাপিস্ট) সাথে সমন্বয় করে সময় বের করাটা খুবই কঠিন। ব্যস্ত মানুষদের জন্য কার্যতঃ অসম্ভব; ব্যয়বহুল তো বটেই। অন্যদিকে, বিন্দুগুলোতে যথাযথভাবে চাপ দেয়া যায় ও প্রতিটি চাপ একশ' ভাগ কার্যকর হয় কেবল নিজের চাপ নিজে দিলেই। ফলে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটির নামকরণ হয়েছে স্বচিকিৎসা।

৭. কি কি রোগে আকুপ্রেশারে সুফল পাওয়া যায়?

সব ধরনের রোগেই আকুপ্রেশারে সুফল পাওয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে যদি রোগের মাত্রা ৮০% অতিক্রম করে থাকে তাহলে আকুপ্রেশার আর কার্যকর হবে না। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য প্রচলিত কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই রোগ নিরাময়ে সাফল্য দেখাতে পারে না।

৮. আকুপ্রেশারে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে কি?

আকুপ্রেশার পদ্ধতিতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেমন:- ঘাড়ের ব্যথা ভাল করতে গিয়ে কাঁধও কিছুটা ভাল হয়ে যায়। তবে কোন ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

৯. এই পদ্ধতির ভিত্তি কি?

আকুপাংচার, সাধারণ আকুপ্রেশার এবং রিফ্লেক্সোলজির প্রায়োগিক ভিত্তি অভিন্ন। মানব দেহে অবিরাম বইছে জৈব বিদ্যুৎ (Bio-electricity) প্রবাহ। শিশুর ভ্রূণ অবস্থাতেই এই বৈদ্যুতিক প্রবাহের ব্যাটারি স্থাপিত হয়ে যায় শরীরে। আমৃত্যু অবিরাম তা থেকে উদগিরিত হচ্ছে বৈদ্যুতিক প্রবাহ যাকে জীবনীশক্তি (Vital force of life) বলেও অভিহিত করা হয়।

আমাদের শরীরের চামড়ার কয়েকটি নির্দিষ্ট রেখা বরাবর এই রেখা প্রবাহিত হয়। ব্যবহারিক বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য যেমন রয়েছে বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক, ঠিক তেমনি দেহের অভ্যন্তরে প্রবহমান এই জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যও রয়েছে বৈদ্যুতিক লাইন বা বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক। দেহের ডান হাতের প্রতিটি আঙ্গুলের ডগা থেকে শুরু হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্দিষ্ট সব রেখা (বৈদ্যুতিক লাইন) ধরে গোটা দেহ ঘুরে শেষ হয় পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের ডগায় গিয়ে।
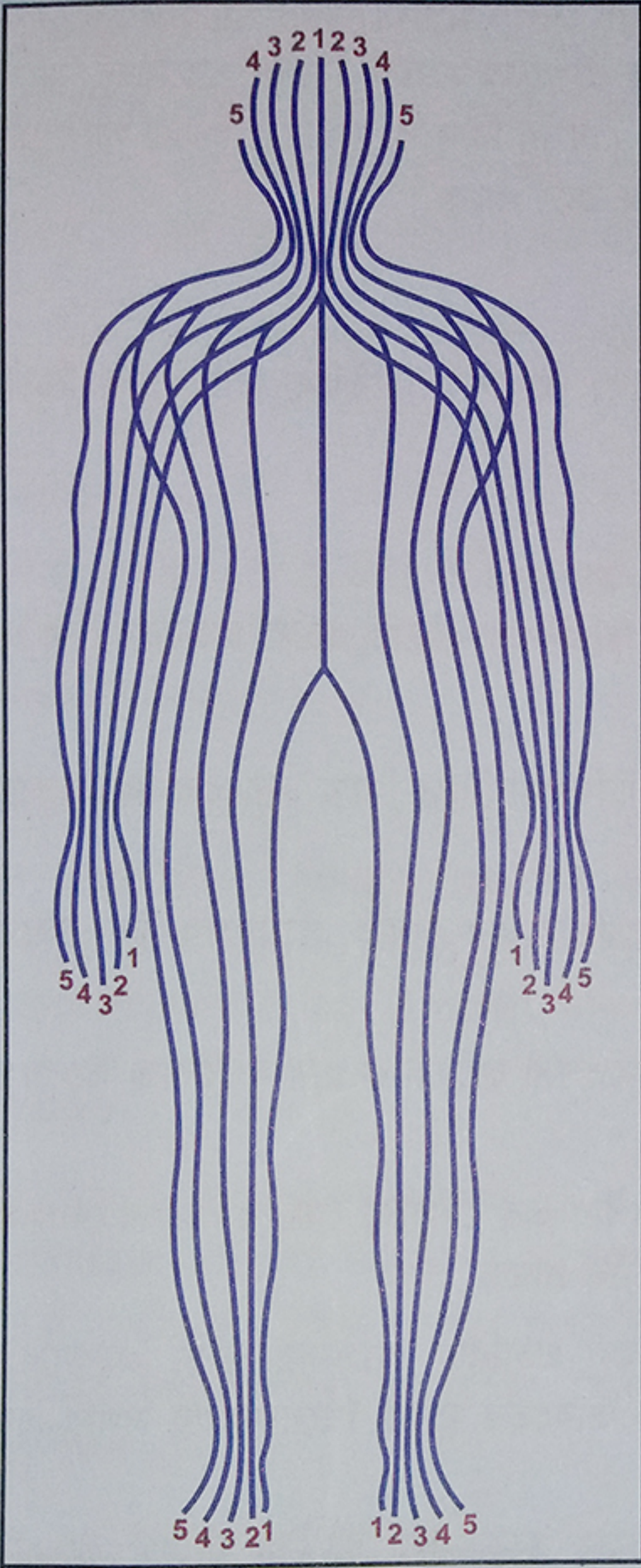
মানবদেহের মেরিডিয়ান রেখা। (চিত্র - ০৯)
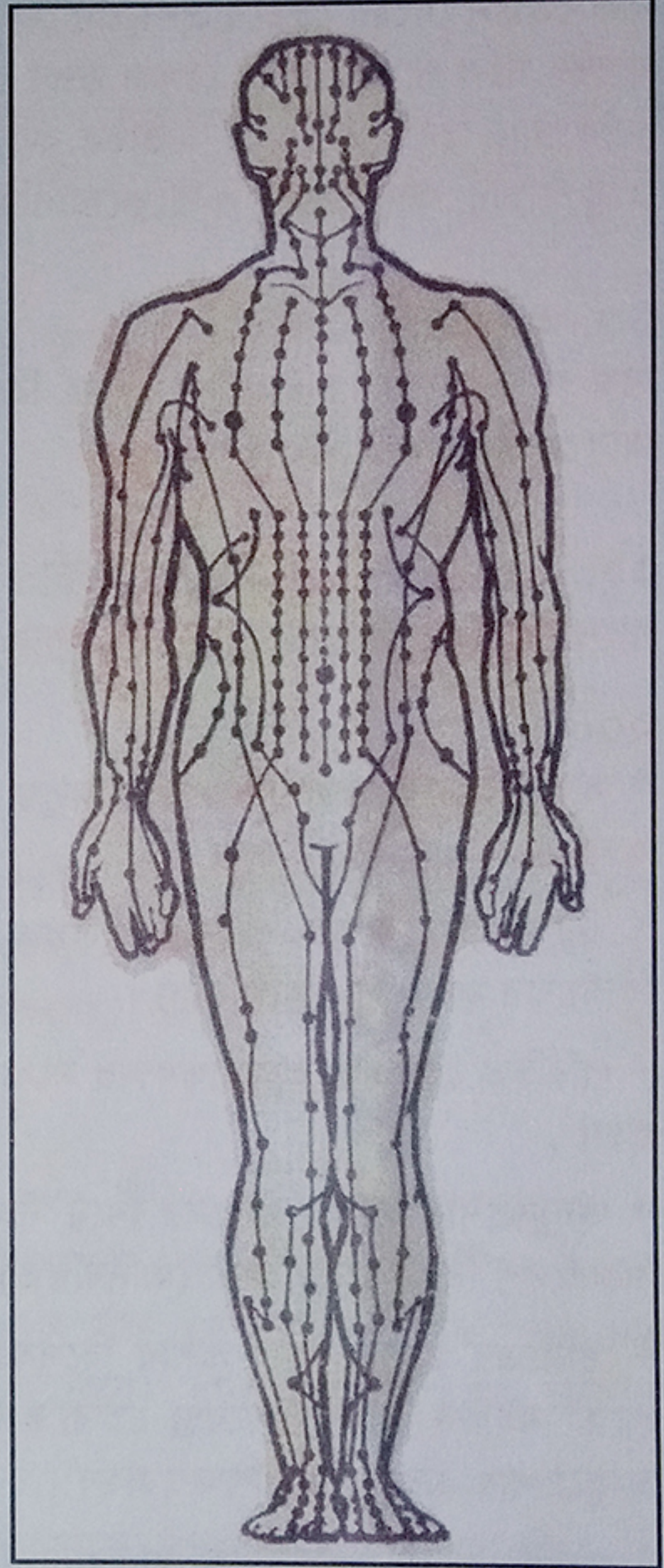
মানবদেহের মেরিডিয়ান রেখার উপর আকুপাংচার বিন্দু। (চিত্র - ১০)

যেসব রেখা বরাবর এই জৈব বিদ্যুৎ প্রবহমান তার প্রণালী অর্থাৎ মেরিডিয়ান (Meridian) নামে পরিচিত। এই বৈদ্যুতিক প্রবাহকে ব্যবহার করেই, এর উপর ভিত্তি করেই আকুপাংচার, আকুপ্রেশার ও রিফ্লেক্সোলজি চিকিৎসা করা হয়।

বিষয়টিকে একটি পরিচিত উদাহরণ দিয়ে সহজভাবে বোঝানো যেতে পারে। দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্ক দাঁড়িয়ে আছে রেল লাইনের উপর। আর রেলওয়ে পরিষেবাকে কার্যকর ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় রেল ষ্টেশন-জংশন দ্বারা।

ঠিক তেমনি দেহের ভিতরে প্রবহমান জৈব বিদ্যুৎ যেসব প্রণালী অর্থাৎ মেরিডিয়ান রেখা বরাবর সচল থাকে, সেসব রেখার উপর রয়েছে ষ্টেশনের মতোই নির্দিষ্ট সব বিন্দু, যাকে বোঝানোর জন্য সুইচ নামে অভিহিত করা যায়। এসব বিন্দু বা সুইচকে কাজে লাগিয়েই আকুপাংচার, আকুপ্রেশার ও রিফ্লেক্সোলজি কাজ করে থাকে।

১০. এই পদ্ধতির স্বীকৃতি কি?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ) সহ উন্নত বিশ্বে এবং আধুনিক চিকিৎসা পন্ডিতদের নিকট আকুপ্রেশার একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।

১১. বাংলাদেশে এই পদ্ধতির চর্চা:

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আকুপ্রেশার তথা স্বচিকিৎসা পদ্ধতি চর্চার একনজর চিত্র :

২০০৪

* সাংবাদিক সাগর সগীর গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিতে গিয়ে ভারতের কলকাতায় আকুপ্রেশার-এর সন্ধান লাভ।

* নিজের ও নিজের পরিবারের উপর আকুপ্রেশার-এর সফল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিস্ময়কর ফলাফল প্রত্যক্ষকরণ।

* পরিচিত রোগগ্রস্ত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আকুপ্রেশার ছড়িয়ে দেয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ।

* আকুপ্রেশার সুফলভোগীদের নিয়ে সাগর সগীর-এর নেতৃত্বে 'স্বচিকিৎসা আন্দোলন বাংলাদেশ' নামে স্বেচ্ছাসেবী (অনিবন্ধিত) সংগঠন প্রতিষ্ঠা।

* ভারতের প্রখ্যাত আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ, বহুল প্রচারিত 'আপনার স্বাস্থ্য আপনারই হাতে' বইটির প্রণেতা দেবেন্দ্র ভোরা'র নিকট ভারতের মুম্বাই গিয়ে সাগর সগীর-এর আকুপ্রেশার-এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

* মুম্বাই থেকে ফিরে এসে রাজধানীসহ দেশের কয়েকটি এলাকায় সাগর সগীরের নেতৃত্বে আকুপ্রেশারের উপর বেশকিছু ঘরোয়া বৈঠক/সেমিনার অনুষ্ঠান।

২০০৫

* সমবায় সংগঠন কিংশুক বহুমুখী সমবায় সমিতির আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীর মিরপুর এলাকার মনিপুরে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আকুপ্রেশার চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ।

* 'কিংশুক স্বচিকিৎসা অনুশীলন কর্মসূচী' নামে দেশে প্রথমবারের মতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আকুপ্রেশার পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং আকুপ্রেশার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা ঘটে।

২০০৬

* রিয়েল এস্টেট কোম্পানী হাইপেরিয়ন ডেভেলপার্সের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় মিরপুর এলাকায় তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর পরিসরে হাইপেরিয়ন আকুপ্রেশার সেন্টার নামে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু।

* ভারতের এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত 'সু-যোগ' আকুপাংচারের উপরে অনুষ্ঠিত শর্ট কোর্সে সাগর সগীরের অংশগ্রহণ।

২০০৭

* সাগর সগীরের নেতৃত্বে আকুপ্রেশার চর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একদল উদ্যোগী ও সেবার ব্রতে উজ্জীবিত তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সমবায় সংস্থা বঙ্গজ পরিবারের সময়োচিত আত্মপ্রকাশ।

২০০৮

* ঔষধ-বিকল্প, নিখরচা, ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ামুক্ত প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি 'আকুপ্রেশার' ছড়িয়ে দেয়ার ব্রতে বঙ্গজ পরিবার-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী স্বচিকিৎসা আন্দোলনের ডাক এবং এ লক্ষ্যেই বঙ্গজ স্বচিকিৎসা পরিবারের অভ্যুদয়।

২০০৯

* স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] শুরু করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সেবামূলক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত [illegible] থাকে একের পর এক আকুপ্রেশারের উপর বৈঠক, সভা, সেমিনার। বঙ্গজ পরিবার আয়োজিত এসব সভা, সেমিনারে উপস্থিত শ্রোতাদের আগ্রহে চলতে থাকে দল বেঁধে (ব্যাচ ব্যাচ করে) আকুপ্রেশারের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ।

* ২৪ জুলাই জাতীয় প্রে[illegible]াবে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় আকুপ্রেশার মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী তথা সুফলভোগীদের নিয়ে পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উর্দ্ধতন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পেশার তিন শতাধিক আকুপ্রেশার সুফলভোগী, আকুপ্রেশার সমর্থকদের এক স্মরণীয় মিলনমেলায় পরিণত হয় এই পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা, হয়ে ওঠে এদেশে আকুপ্রেশার চর্চার অগ্রগতির একটি মাইল ফলক।

২০১০

* ১১ মে দেশে আকুপ্রেশার প্রসারে সংযোজিত হয় নতুন এক অধ্যায়। আকুপ্রেশার তথা স্বচিকিৎসা নিয়ে কাজ করার আইনী অনুমোদন নিয়ে বঙ্গজ স্বচিকিৎসা পরিবার সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'সোসাইটি ফর বঙ্গজ স্বচিকিৎসা পরিবার' নামে।

* আকুপ্রেশার-এর উপর চলমান বৈঠক, সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, নিবেশ (ক্যাম্প)-এর ধারাবাহিকতায় এই পদ্ধতির কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা পৌঁছে যায় বস্তুত প্রশ্নাতীত মাত্রায়। এর প্রকাশ ঘটে ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত আকুপ্রেশার মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী তথা সুফলভোগীদের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভায় যেখানে দেশের তৎকালিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তিনি আকুপ্রেশারের একজন সুফলভোগী। তিনি সেনাবাহিনী, বিজিবি (সাবেক বিডিআর) এবং পুলিশ বাহিনীকে আকুপ্রেশার শেখানো দরকার বলে মত প্রকাশ করেন।

আকুপ্রেশার মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী, সুফলভোগী ও সুফল প্রত্যক্ষকারী প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষের মিলন মেলায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে আকুপ্রেশার পৌঁছে দেয়ার।

২০১১

* ১৮ এপ্রিল ২০১১ রাজধানীর বিএমএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সাগর সগীর প্রণীত স্বচিকিৎসা প্রয়োগবিধি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব। দৈনিক আমাদের সময়ের সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। একই সাথে তিনি নিখরচা এই প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিটি দরিদ্র মানুষের মাঝে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

২০১২

* ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২, জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় সাগর সগীর প্রণীত অনুবাদ **Acupressure: A Self Treatment Manual**-এর প্রকাশনা উৎসব। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার এড. আব্দুল হামিদ।

পরিচ্ছেদ -২

কিভাবে কাজ করে আকুপ্রেশার?

পরিচ্ছেদ সূচি

০১. আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

০১. মস্তিস্ক (Brain)
০২. মস্তিস্কের স্নায়ু (Cranial nerves)
০৩. পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland)
০৪. পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland)
০৫. মাথার শিরা (Head Veins)
০৬. গলা (Throat)
০৭. ঘাড় (Neck)
০৮. থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid & parathyroid glands)
০৯. মেরুদন্ড (Spinal column)
১০. অর্শ (Piles)
১১. প্রোস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland)
১২. স্ত্রী ও পুরুষ যৌনাঙ্গ (Vagina & penis)
১৩. জরায়ু (Uterus)
১৪. ডিম্বাশয় (Ovaries)
১৫. অন্ডকোষ (Testes)
১৬. লসিকা গ্রন্থি (Lymph gland)
১৭. নিতম্ব ও হাঁটু (Hip & knee)
১৮. মূত্রাশয় (Urinary bladder)
১৯. ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine)
২০. মলাধার (Colon)
২১. এপেন্ডিক্স (Appendix)
২২. পিত্তথলি (Gall bladder)
২৩. যকৃত (Liver)
২৪. কাঁধ (Shoulder)
২৫. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)
২৬. বৃক্ক (Kidney)
২৭. পাকস্থলী (Stomach)
২৮. এড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal glands)
২৯. নাভিচক্র (Solar Plexus)
৩০. ফুসফুস (Lungs)
৩১. কান (Ear)
৩২. শক্তি (Energy)
৩৩. কানের স্নায়ু (Auditory nerve)
৩৪. ঠান্ডা (Cold)
৩৫. চোখ (Eye)
৩৬. হৃৎপিন্ড (Heart)
৩৭. প্লীহা (Spleen)
৩৮. থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)
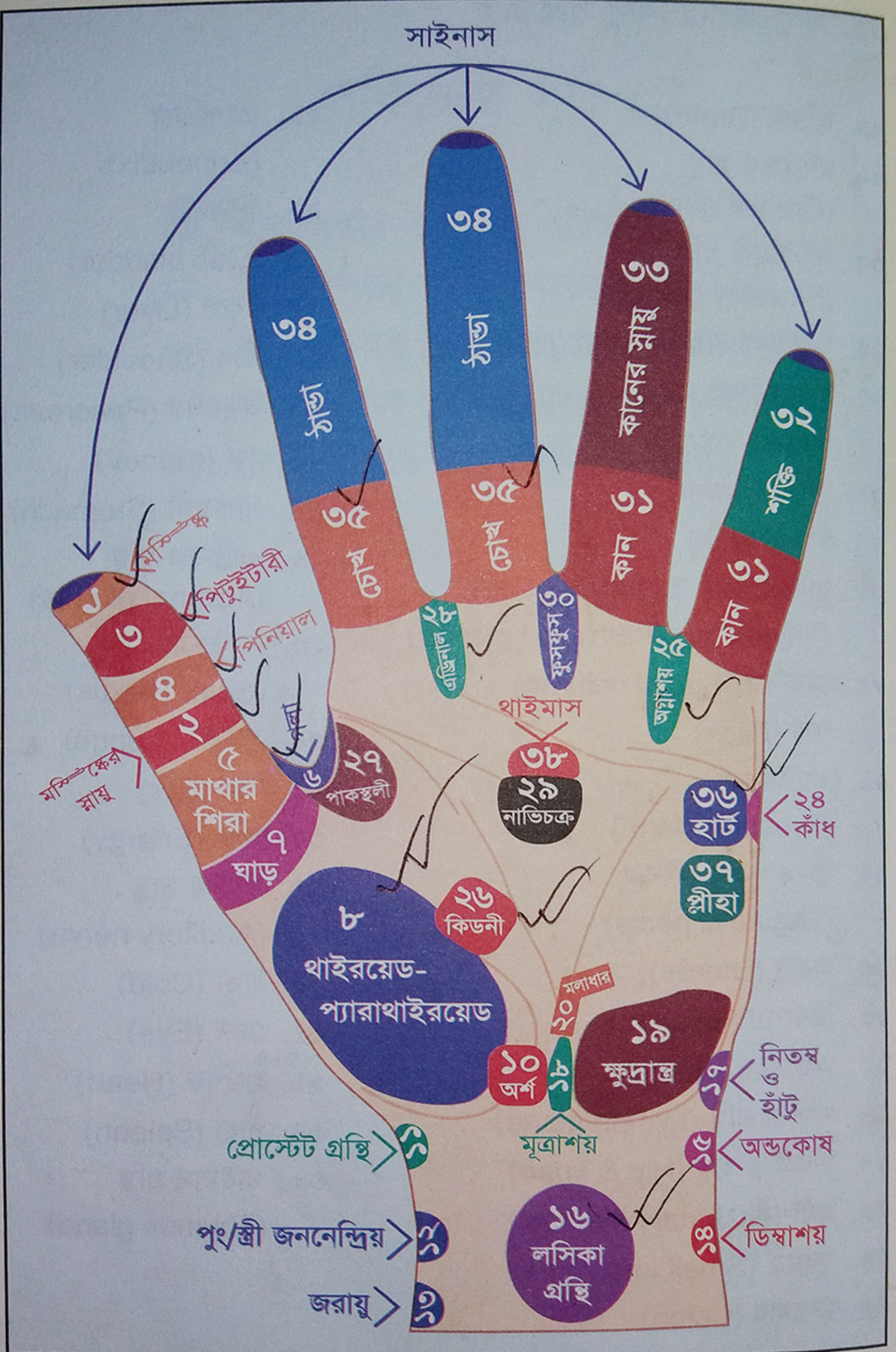
বাম হাতের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১১)

ডান হাতের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১২)

ডান পায়ের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১৩)

বাম পায়ের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১৪)

মধ্যমা
(M.F.)
L.B.
৭
মেরুদন্ড
এলার্জি
নার্ভাল পয়েন্টস্
(N.P.)
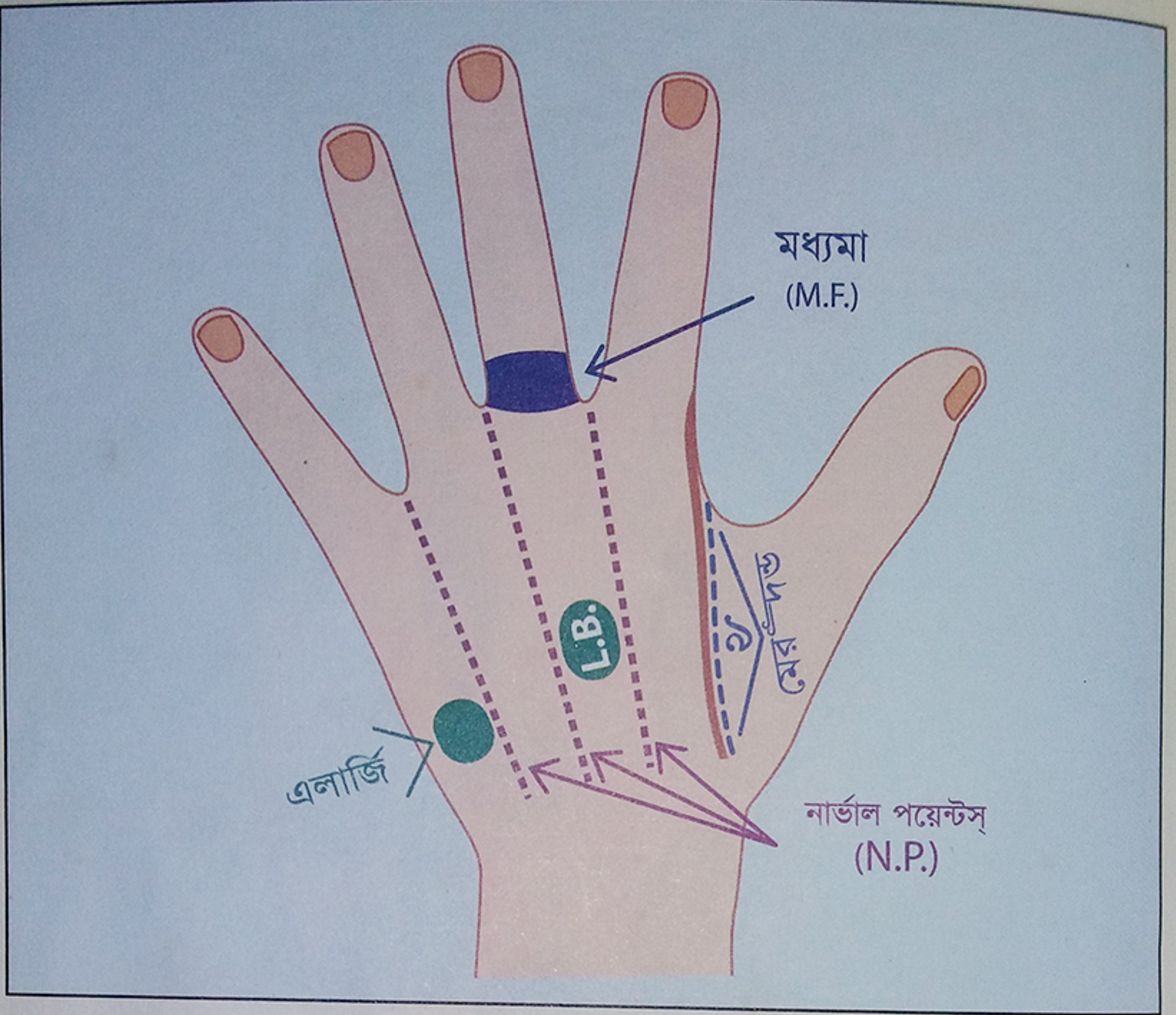
বাম হাতের উল্টো পিঠের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১৫)
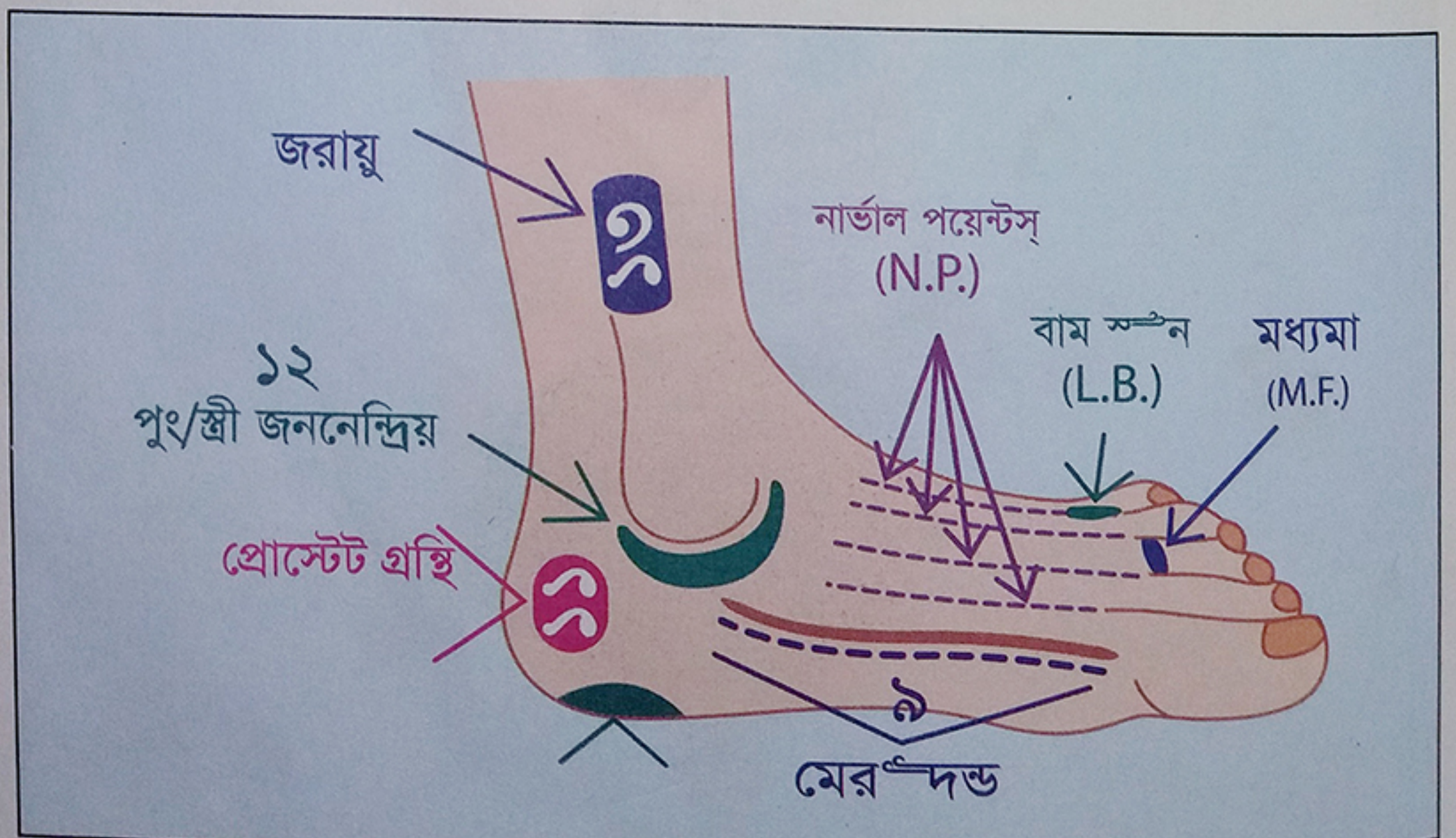
পায়ের উপর অংশের ভিতর দিকের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১৬)

১৮
মূত্রাশয়

মধ্যমা
(M.F.)
মেরুদণ্ড
৭
R.B.
নার্ভাল পয়েন্টস্
(N.P.)
এলার্জি
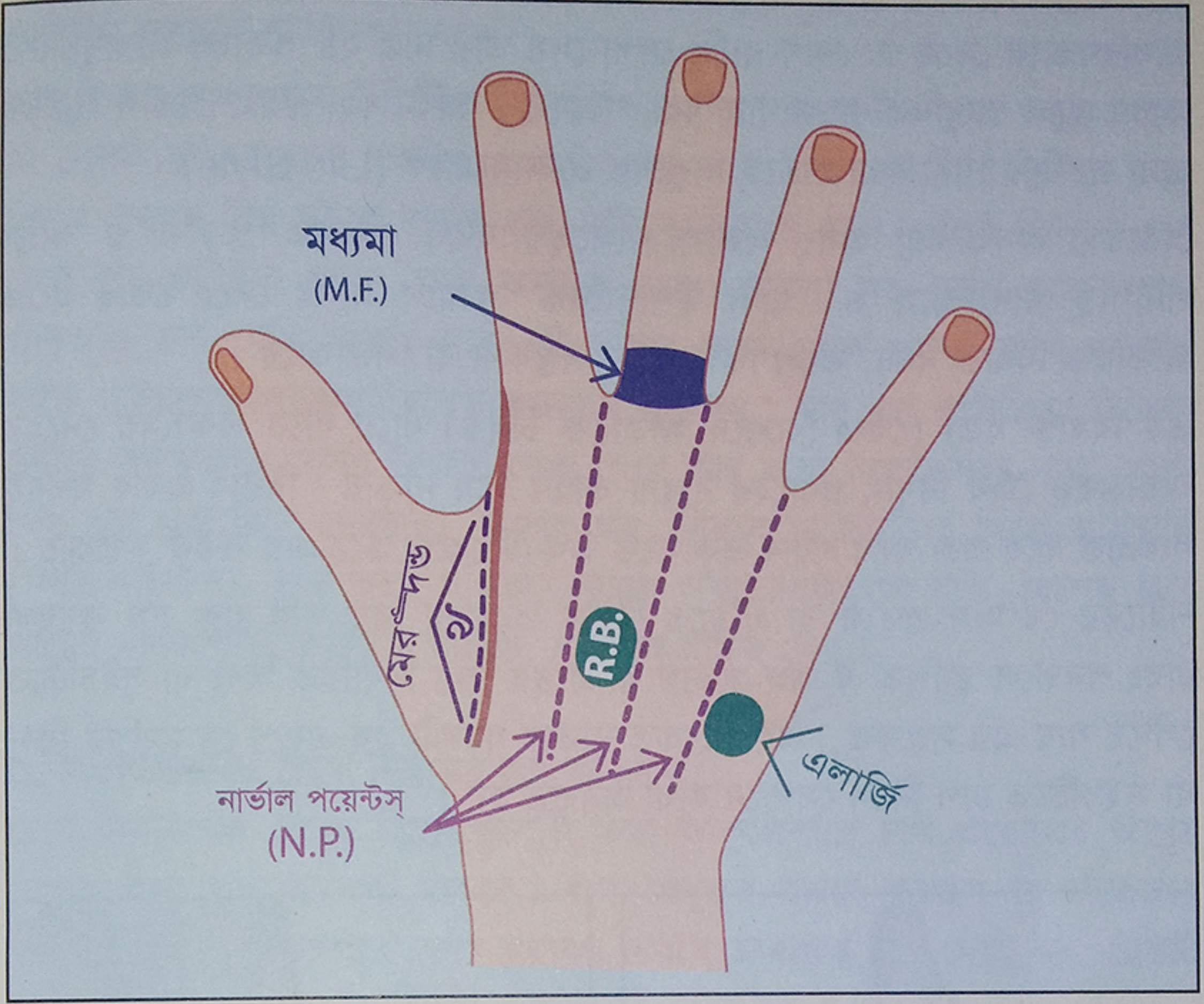
ডান হাতের উল্টো পিঠের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১৭)
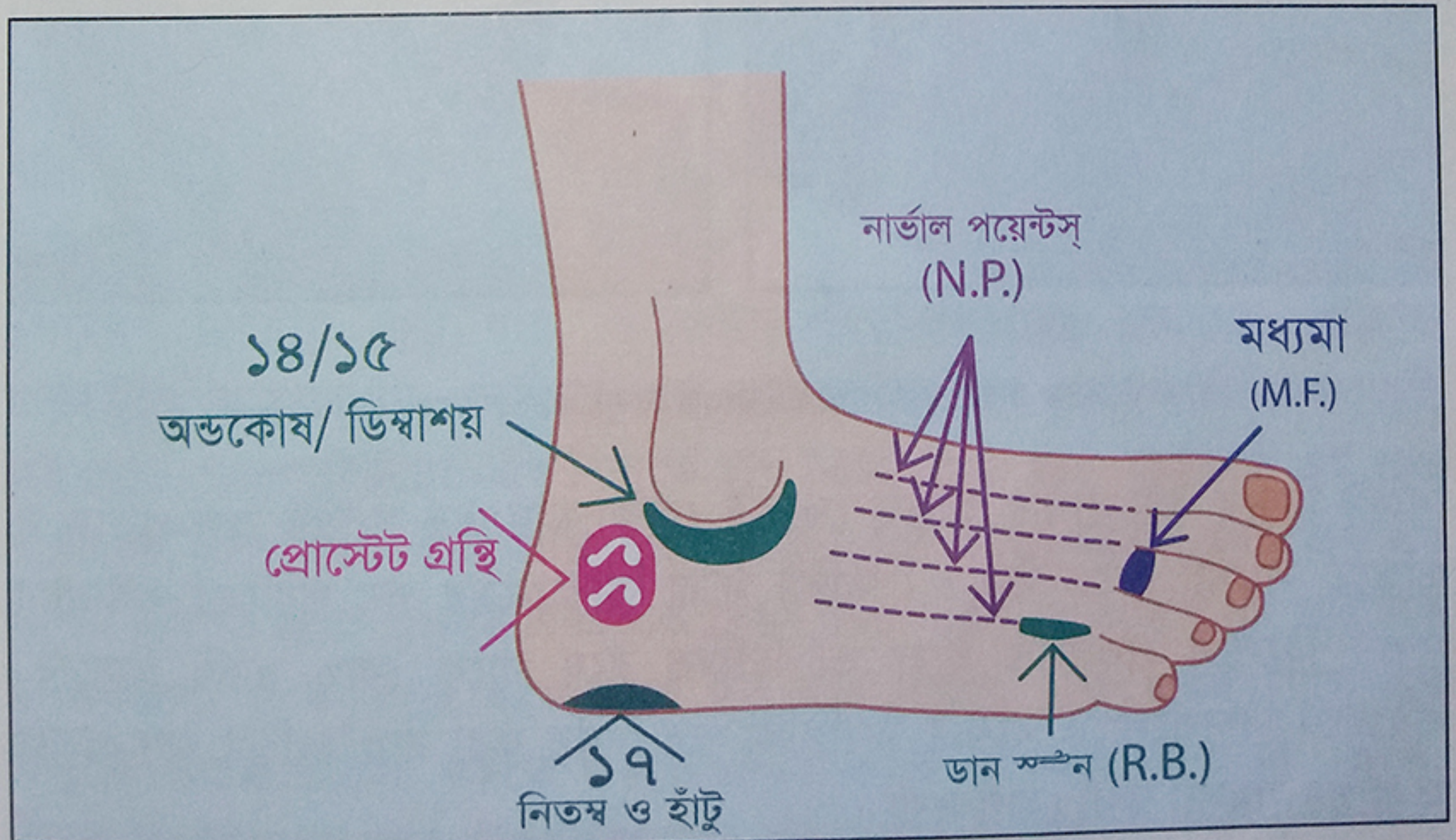
পায়ের উপর অংশের বাহিরের দিকের বিন্দুসমূহ। (চিত্র - ১৮)

২. রিফ্লেক্সোলজি তথা আকুপ্রেশারে রোগ নির্ণয়ের উপায় কি?

সাধারণভাবে দেহে যে রোগ-ব্যাধি দেখা দেয় তার মাত্র ২৮ শতাংশ জীবাণুঘটিত কারণ বলে আধুনিক গবেষণায় ধরা পড়েছে। বাকি ৭২ শতাংশ রোগ ব্যাধির জন্য সরাসরি দায়ী করা হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রাকে (Life Style)।

অজ্ঞতা, অসতর্কতা এবং অভ্যাস-দাসত্বের ফলে প্রধানত প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য পরিপন্থি খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য উপাদানের কারণে মানব দেহে তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত বিষাক্ত বর্জ্য, তরল কিম্বা কঠিন বস্তুকণা বা পিন্ডাকারে।

এই বিষাক্ত বর্জ্য (ক্ষেত্র বিশেষে অতিরিক্ত চর্বিও) ধীরে ধীরে একসময় দেহের অভ্যন্তরস্থ জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ প্রবাহ যখনই বাধাগ্রস্ত হতে শুরু করে শরীর প্রকৃতিতে তখনই বেজে উঠে এর সতর্ক সংকেত।

শরীরের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের বিঘ্ন সৃষ্টি শুরু হয় করতল এবং পদতলে স্থাপিত ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থির জন্য নির্ধারিত বিন্দু বা সুইচটিতে পৌঁছে যায় এর সংকেত। এই সংকেত বার্তার ধরনটি হয় এরূপ যে সংশ্লিষ্ট বিন্দু বা সুইচটিতে চাপ দিলে সেখানে ব্যথা অনুভূত হয়।
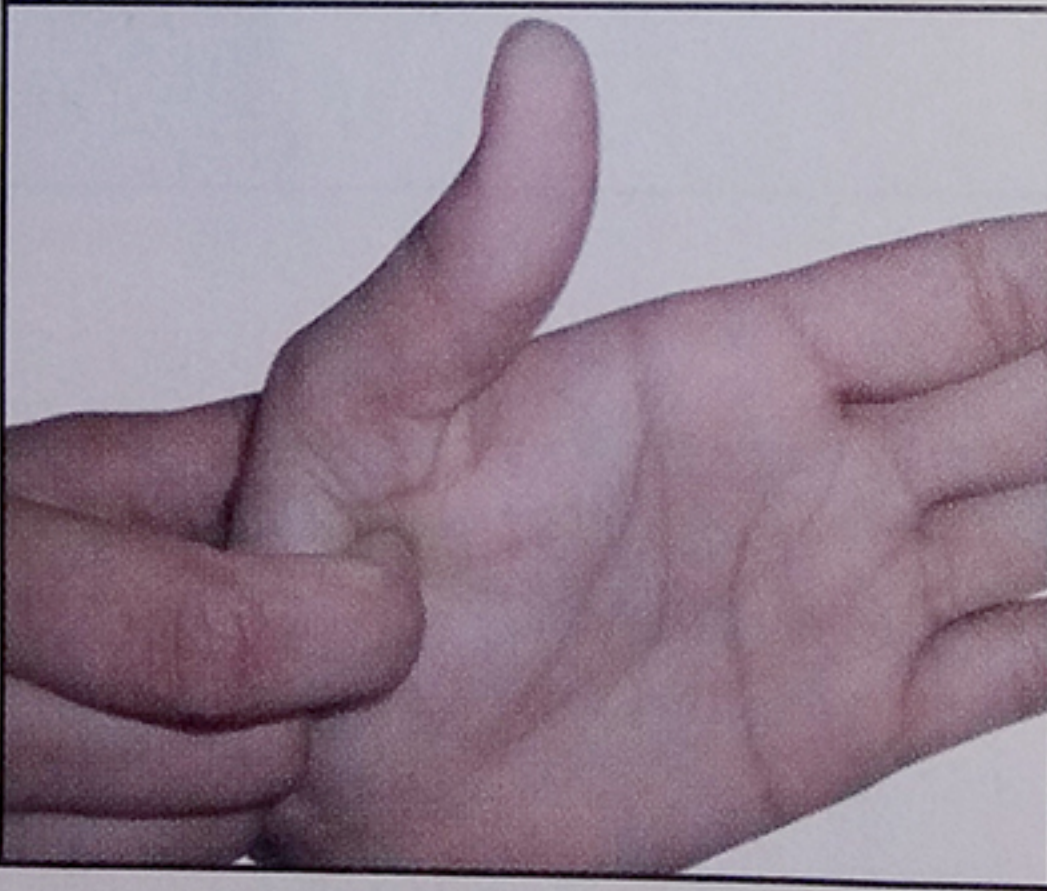
(চিত্র - ১৯)

(চিত্র - ২০)

হাত ও পায়ে থাইরয়েড-প্যারাথাইরয়েড বিন্দুতে চাপ দিয়ে রোগ নির্ণয়।

নির্দিষ্ট বিন্দুর এই ব্যথার অস্তিত্ব থেকেই বোঝা যায় এর সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিতে সমস্যা বেড়ে উঠছে। নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রমের পর শরীরের কষ্টদায়ক লক্ষণ হিসেবে প্রকাশিত হলে তা চিহ্নিত হয়ে থাকে রোগ ব্যাধি হিসাবে। এইভাবে বিন্দুগুলোতে ব্যথার উপস্থিতি ধরে নির্ণয় করা যায় সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থির সমস্যা তথা রোগ দশা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, থাইরয়েড-প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির যে বিন্দু তথা সুইচটি

রয়েছে পৃথকভাবে হাতে এবং পায়ে তাতে চাপ দিয়ে এই গ্রন্থি দুটির গোলযোগজনিত শারীরিক অসুস্থতা শনাক্ত করা সম্ভব।

স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় উল্লিখিত বিন্দুতে চাপ দিলে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হবে না কেবল চাপের জন্য সহনীয় ব্যথা পাওয়া যাবে কিন্তু এই গ্রন্থি দুটিতে জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে অর্থাৎ গ্রন্থি দুটি সমস্যাগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট বিন্দুতে চাপ দিলে সূঁচ ফোটার মতো ব্যথা অনুভূত হবে। সমস্যা যত বেশি হবে ব্যথার তীব্রতাও তত বেশি হবে। আর এই ব্যথার মাত্রা থেকে বোঝা যাবে আক্রান্ত ব্যক্তি থাইরয়েড-প্যারাথাইরয়েড সমস্যায় ভুগছেন। আর এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শরীরে পর্যায়ক্রমে যেসব উপসর্গ দেখা দেবে তার মধ্যে রয়েছে ঘাড় ব্যথা, ঘাড়ে খিল ধরা (ফ্রোজেন শোল্ডার), কশেরুকার বিকার বা সামনের দিকে স্থানচ্যুতি (স্পন্ডিলাইটিস), হাড় ক্ষয়ে যাওয়া, হাড়ের অস্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধি, বিশেষ করে পায়ের মাংসপেশীতে খিঁচুনি ইত্যাদি সমস্যার ইঙ্গিত দেয়।

৩. আকুপ্রেশারে রোগ নিরাময় হয় কীভাবে?

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে রিফ্লেক্সোলজি তথা আকুপ্রেশারে চাপ প্রয়োগের আশ্রয় নেয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। ব্যথা অনুভূত হওয়া করতল ও পদতলের নির্দিষ্ট বিন্দু/ বিন্দুগুলোতে যখন যথাযথ নিয়মে ক্রমাগত চাপ দেয়া হয়, প্রতিটি চাপের ফলে তা থেকে তৈরি হয় এক একটি বৈদ্যুতিক ঢেউ।

সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থির যে অংশে বিষাক্ত বর্জ্য রয়েছে তার উপর গিয়ে সরাসরি আছড়ে পড়ে এই বৈদ্যুতিক ঢেউ এবং ক্রমাগত ঢেউয়ের চাপে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে ঐ বিষাক্ত বর্জ্য অপসৃত হয়ে সরে এসে ধাবিত হয় কিডনীর মুখে। পরবর্তীতে তা কিডনী হয়ে বেরিয়ে যায় দেহ থেকে এবং রোগের নিরাময় ঘটে বিনা ঔষধে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, থাইরয়েড-প্যারাথাইরয়েড সমস্যায় আক্রান্ত মানুষটিকে আকুপ্রেশার পদ্ধতিতে সুস্থ করতে হলে এর প্রয়োগ বিধি অনুযায়ী থাইরয়েড-প্যারাথাইরয়েড-এর বিন্দুতে চাপ দিয়ে যেতে হয়। ক্রমাগত এই চাপ প্রয়োগের ফলে ধীরে ধীরে গ্রন্থি দুটির সমস্যা দূর হতে থাকে। দেহ প্রকৃতির আশ্চর্য নিদর্শন হচ্ছে এসময় একদিকে যেমন গ্রন্থি দুটির গোলযোগ সৃষ্ট শারীরিক উপসর্গগুলো একে একে কমে গিয়ে দূর হতে থাকে, ঠিক একই সাথে এর বিন্দুতে ব্যথার তীব্রতা কমতে কমতে এক পর্যায়ে তা আর থাকে না। ফলে, বিন্দুর ব্যথাহীনতা আর উপসর্গসমূহের অনুপস্থিতি থাইরয়েড-প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি দুটির সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা নিশ্চিত করে।

আর এভাবেই আকুপ্রেশারের মাধ্যমে ঔষধ ছাড়া অনায়াসেই, এমনকি নিজেই নিজের সুস্থতা নিশ্চিত করা যায়।

৪. আকুপ্রেশারে রোগ প্রতিরোধ হয় কীভাবে?

`Prevention is better than cure' -প্রবাদসম এই ইংরেজি বাক্যটি দেশে দেশে স্বাস্থ্যনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। বস্তুত: রোগ প্রতিরোধ সফলভাবে রিফ্লেক্সোলজিতেই সম্ভব। এর কারণ হচ্ছে "আমরা যখন ভুগি তখনই কেবল নিজেকে, নিজেদেরকে মনে হয় রোগী।"

ব্যাধিগ্রস্ত একজন মানুষ তখনি রোগে ভুগতে শুরু করে যখন রোগের প্রকোপ বা বিস্তার বা মাত্রা অথবা তীব্রতা ৫০-৬০ শতাংশ ক্ষেত্রবিশেষে, ৬৫/৭০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছায়। এ অবস্থায় রোগাক্রান্ত মানুষটি কাহিল হয়ে পড়ে - আর চলতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় শয্যার। যাকে বলে শয্যাশায়ী হওয়া।

এমনকি আধুনিক প্যাথলজিক্যাল বা ক্লিনিক্যাল টেস্টে একটি রোগ তখনি ধরা পড়ে যখন তা ৪০ শতাংশ অতিক্রম করে। রিফ্লেক্সোলজি নামক আকুপ্রেশারে রোগের মাত্রা ৫-১০ বা সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশের মধ্যেই ধরা পড়তে বাধ্য; যখন তা আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে আদৌ রোগ হিসেবে, রোগের লক্ষণ হিসেবে ধরাই পড়েনি অর্থাৎ অজানাই থেকে গেছে।

বিষয়টি এজন্যই হয় যে, দেহে জমে যাওয়া, জমতে থাকা বিষাক্ত বর্জ্য মেরিডিয়ান রেখা তথা জৈব বৈদ্যুতিক চ্যানেলে ক্রমে পুঞ্জিভূত হতে শুরু করে। তা যখন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তখন এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বাধাগ্রস্ত হতে থাকে ঠিক একই তালে।

সুস্থ একজন মানুষ যখন নির্দিষ্ট সময় অন্তর করতল ও পদতলের বিন্দুগুলিতে রুটিন ওয়ার্কের মতই চাপ দিতে থাকেন তখন তাতে ব্যথা পেলেই তিনি বুঝতে পারেন তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ/ গ্রন্থিতে সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে, যার অর্থ রোগ বেড়ে উঠছে যদিও তখনও তার কাছে তা রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে উঠেনি। এ অবস্থায় ঐ বিন্দুতে চাপ দিলে বেড়ে উঠা রোগকে অঙ্কুরেই নির্মূল করা সম্ভব এবং এভাবেই সম্ভব রোগের সফল প্রতিরোধ।

৫. কোন বিন্দুতে ব্যথা পেলে কী রোগ?

বিন্দু/নম্বর	সমস্যাসমূহ
নাভিচক্র	আঙ্গুলের দাগের দূরত্ব বেশী হলে মাঝে মাঝে তলপেটে ব্যথা হবে। হজম সমস্যাও হতে পারে। (পৃঃ ৪৪, চিত্র ২১ দ্রঃ)
সাইনাস	২-১টি সাইনাস বিন্দুতে ব্যথা পেলে নির্দিষ্ট দাঁতের সমস্যা; যেমন রক্তপড়া, শিরশির করা, মাড়ি ফুলে ওঠা, মাঝে মাঝে দাঁতের গোড়ায় ব্যথা অনুভব করা।
১-৫	বেশি ব্যথা পেলে মাইগ্রেন বা তীব্র মাথা ব্যথা।
শুধু ৩, ৪	মাঝে মাঝে মাথা ব্যথা, ভুলে যাবার প্রবণতা।
৬	গলা ব্যথা, টনসিল প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, গিলতে ব্যথা অনুভব করা।
৮	থাইরয়েড সমস্যা, হাত-পা ব্যথা, জোড়ায়- জোড়ায় ব্যথা, ঘাড়ে মেদ জমা।
৭, ৯	স্পন্ডিলাইটিস, কোমর ব্যথা, পিঠে ব্যথা।
১০, ২০	কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইল্‌স, অনিয়মিত পায়খানা, পায়খানার রাস্তায় যন্ত্রণা, চুলকানি, রক্তপড়া।
১১, ১৮	ইউরিন ইনফেকশন, প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া, প্রস্রাব কম/ বেশি, বেগ ধরে রাখতে না পারা, রাতে মূত্রবেগের জন্য বার বার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট সমস্যা।
১২, ১৩, ১৪	মহিলাঃ মাসিক অনিয়মিত, তলপেটে ব্যথা, অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা কম রক্তস্রাব, সাদাস্রাব, যৌনাঙ্গে চুলকানি, ব্যথা, সন্তান ধারণে অক্ষমতা।
১২, ১৫	পুরুষঃ হস্তমৈথুন, দ্রুত বীর্যপাত, যৌনাঙ্গ দুর্বল ও অকৃতকার্য।
১৭	হাঁটু, নিতম্ব ব্যথা।
১৯	মাঝে মাঝে আমাশয়, পাতলা পায়খানা, সকালে ঘুম থেকে উঠার পর পায়ের তালু ব্যথা হলে বুঝতে হবে ইউরিক এসিড বেশী।
২২ ও ২৩	গ্যাস্ট্রাইটিস, চুল পড়া, হাত-পা গরম, মাথা গরম ও জ্বালা, হাত-পা ঘামা, বুকের ডান পাশ হতে ব্যথা শুরু হয়ে ডান পাশের পিঠে সূঁচ বিধাঁর মত ব্যথা অনুভূত হতে পারে।
২৪	কাঁধে ব্যথা, হাত নাড়াতে না পারা, ফ্রোজেন শোল্ডার।

২৫	নিম্ন রক্তচাপ, প্রচন্ড মাথাব্যথা। তিনটিতেই অনেক বেশি ব্যথা হলে ডায়াবেটিস, কম ব্যথা
১৬ ও ২৮	হলে ডায়াবেটিস বর্ডার লাইনে।
২৭	বদহজম, গ্যাস্ট্রাইটিস, ঢেকুর, অরুচি, বমি বমি ভাব।
২৮	এসিডিটি, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব।
২৮ ও ৪	খুব বেশি ব্যথা হলে উচ্চ রক্তচাপ। শুধু ৪ নং-এ ব্যথা হলে হাত-পায়ে পানি জমা (কিডনীর জন্য নয়)।
৩০, ৩৪, ৬	প্রত্যেকটিতে বেশি ব্যথা হলে শ্বাসকষ্ট, এ্যাজমা/ হাঁপানি, গলা খুশখুশ, ঠান্ডা লাগার প্রবণতা। এর সাথে সাইনাসে ব্যথা পেলে সাইনোসাইটিস।
৩১ ও ৩৩	কানের সমস্যা, ব্যথা, কম শোনা, চেপে আছে বলে মনে হয়, শো-শো শব্দ করা।
৩২	নিঃশক্তি, দুর্বলতা, ঘুমঘুম ভাব।
৩৫	চোখের সমস্যা, চোখে কম দেখা, পানি পড়া।
৩৬	মাঝে মাঝে বুকের বাম পাশে ব্যথা, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, বাম হাত ব্যথা করা, শরীরের বাম পাশে দূর্বল লাগা। অতিরিক্ত ব্যথা হার্ট ব্লক এর ইঙ্গিত দেয়।
৩৭	২৮, ৩৬ ও ৩৭ নং বিন্দুতে বেশি ব্যথা থাকলে বোঝা যাবে কোলেষ্টেরল বেশি। আর এর সাথে ২৫-এ ব্যথা থাকলে রক্তস্বল্পতা।
M.F. (মধ্যমা)	মানসিক দুশ্চিন্তা, দাঁত ও হাতের যে কোন অংশে ব্যথা, অজ্ঞান হওয়া, হার্টের সমস্যা।
N.P. (নার্ভাল পয়েন্ট)	স্নায়ু চাপ, অনিদ্রা, হাত-পা চিবানো, অবশ অবশ ভাব, নিঃশক্তিবোধ, আঙ্গুলের জড়তা, প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত।
বাম/ডান স্তন (L.B./R.B.)	কম ব্যথা হলে স্তন-এ চিলিক দিয়ে ব্যথা, ব্যথা বেশি হলে স্তন-এ সিস্ট, ব্যথা তীব্র হলে টিউমার, এমনকি ক্যান্সার-এর ইঙ্গিত বহন করে।
সায়াটিকা (S.P.)	মাংসপেশীতে ব্যথা, শিরা টান পড়া, কোমর ও হাঁটু ব্যথা, অনিদ্রা, মেরুদন্ড সোজা করতে না পারা, বেশিক্ষণ দাঁড়ালে পায়ে ব্যথা।

পরিচ্ছেদ -৩

আকুপ্রেশার করার নিয়ম

পরিচ্ছেদ সূচি

২৩. চাপের মাত্রা কতটুকু হবে?

২৪. দিনে রাতে কতবার আকুপ্রেশার করা যাবে?

২৫. চাপের সংখ্যা কখন কম, কখন বেশি হবে?

২৬. কিভাবে চাপ দেয়া উচিত?

২৭. চাপ প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ বিন্দুতে বিশেষ বিশেষ মনোযোগের দরকার পড়ে কিনা?

২৮. ব্যথার পরিমাণ কমে আসা থেকে কি বোঝা যাবে?

২৯. ব্যথা একেবারেই না থাকলে করণীয় কি?

৩০. আকুপ্রেশার প্রয়োগে সতর্কতা কি?

৩১. এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত?

৩২. চলতে ফিরতে বসতে কথা বলতে বলতে আকুপ্রেশার করা যায় কি?

৩৩. এতে কি পরিপূর্ণ সুফল পাওয়া যাবে?

৩৪. শিশুদের ক্ষেত্রে ঘুমানোর সময় কি আকুপ্রেশার করা যায়?

৩৫. রোগ ভাল হচ্ছে কিনা কি করে বুঝব?

৩৬. কোন কোন ক্ষেত্রে হাতের বিন্দুর ব্যথা চলে যায় কিন্তু পায়ের বিন্দুর ব্যথা থাকে সেক্ষেত্রে কি করণীয়?

৩৭. বার্ধক্য প্রতিরোধ ও তারুণ্য বজায় রাখার বিন্দু কোন্‌টি?

৩৮. আকুপ্রেশারে রোগ ভাল হতে কতদিন সময় লাগে?

৩৯. গুরুত্বভেদে বিন্দুর শ্রেণীকরণ করা যায় কি?

১. উপচার কি ?

শব্দগত অর্থে উপচার মানে সেবা বা চিকিৎসা বোঝায়। উপচার দ্বারা পূজা বা প্রার্থনাও বোঝায়। আকুপ্রেশার চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপচার শব্দটি করতল ও পদতলের নির্দিষ্ট কিছু বিন্দুতে আঙ্গুল বা ভোঁতা কাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে নির্ধারিত নিয়ম ধরে ক্রমাগত চাপ দেয়াকে বোঝায়।

বোঝার সুবিধার্থে একে ফিজিওথেরাপির মত আকুথেরাপিও বলা যেতে পারে তবে আকুথেরাপি শব্দটির চেয়ে বাংলা উপচার শব্দটির ব্যবহারই যথাযথ। কারণ প্রাকৃতিক এই চিকিৎসা পদ্ধতির অনুশীলন কার্যত এক ধরনের সাধনা বা প্রার্থনার নামান্তর।

২. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপচার বলতে কি বোঝায় ?

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপচার বলতে বোঝায় একজন রোগী যখন অনেকগুলো শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন তখন তার মধ্য থেকে তাকে বেশি ভোগাচ্ছে যে রোগটি বা যে দুই/ তিনটি রোগ সেগুলোকে আগে চিহ্নিত করে নেয়া।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে শরীরে কোন রোগ একা আসে না। একজন মানুষ একটি শারীরিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করলে তা নিরাময়ের উদ্যোগ না নিলে এ থেকে আরও কতগুলো রোগ তৈরি হতে থাকে। সেক্ষেত্রে রোগের উৎস-মূল অর্থাৎ উৎস-রোগটিকে চিহ্নিত করে নেয়া দরকার আগে। এবং সেই রোগের বিন্দুগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপচার করা দরকার।

অগ্রাধিকার নীতির আওতায় রোগীকে বেছে নিতে হয় তিনি আগে কোন্ রোগ হতে নিরাময় চান। বেশি ভোগাচ্ছে এমন রোগ (২-৩ টির মধ্যে সীমিত রাখলে ভাল হয়) আগে চিহ্নিত করে সেই জন্য জরুরী, প্রয়োজনীয় ও সহায়ক বিন্দুগুলো চিহ্নিত করে তাতে উপচার প্রয়োগ করে যাওয়া।

ঐ রোগগুলো নিরাময় লাভের পর অর্থাৎ ঐ রোগ সংশ্লিষ্ট বিন্দুগুলোর ব্যথা দূর হওয়ার পর অন্যান্য রোগের বিন্দুগুলোও একইভাবে চিহ্নিত করে একই নিয়মে উপচার করে যেতে হবে। এভাবে প্রতিবেলা ৩০-৪৫ মিনিটেই উপচার শেষ করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে নিজে নিজে করলে প্রথমে কিছুদিন কেবল হাতের বিন্দুগুলো করা যেতে পারে। হাতের বিন্দুগুলোর ব্যথা দূর হওয়ার পর পায়ের একই বিন্দুগুলোতে অথবা উল্টো করে আগে কেবল পা করে পায়ের বিন্দুগুলোর ব্যথা দূর হওয়ার পর হাতে শুরু করা যেতে পারে। এতে প্রতি বেলা উপচারের সময় কমিয়ে আনা সম্ভব।

৩. প্রতিবার উপচারে কতটুকু সময় নেয়া উচিত ?

এটা নির্ভর করবে রোগের অবস্থা এবং রোগ মুক্তির জন্য রোগী কতটুকু আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান তার উপর। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেকগুলো শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত একজন রোগী মনোযোগ দিয়ে নিজের উপচার নিজে করলে প্রথমে সোয়া ঘন্টা এবং দুই-তিন কি চার সপ্তাহের ব্যবধানে তা কমিয়ে ৪০ মিনিট পর্যন্ত করা যায় প্রতিবেলা।

অভিজ্ঞতায় এও দেখা গেছে অন্য কেউ উপচার করে দিলে সবকটি বিন্দুতে পরিপূর্ণ উপচার করতে হয় তাহলে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লেগে যায়। এক্ষেত্রে সময় কমিয়ে ৪০-৪৫ মিনিটে নামিয়ে আনা সম্ভব একই সঙ্গে দুইজন উপচার করে দিলে কিম্বা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রোগ নিরাময়ে প্রয়োজনীয় বিন্দু চিহ্নিত করে কেবল সেগুলোতে উপচার করলে।

৪. আকুপ্রেশার প্রয়োগ প্রক্রিয়া কি ?

আগেই বলা হয়েছে এই পদ্ধতিতে রোগ নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধে হাতের আঙ্গুল, কলম বা পেন্সিলের ভোঁতা অংশ, উপযোগী কোন কাঠি বা কাঠি জাতীয় কোন কিছু দিয়ে চাপ প্রয়োগ করা হয় করতল ও পদতলের নির্দিষ্ট কিছু বিন্দুতে।

এজন্য প্রথমে জানতে হয় ওই বিন্দুগুলোর নাম। তার পর দেখে নিতে, চিনে নিতে হয় বিন্দুগুলোর সঠিক অবস্থান। সবশেষে জেনে নিতে হয় বিন্দুগুলোতে চাপ দেয়ার নিয়ম এবং ক্রমাগত প্রয়োগের মধ্য দিয়েই রপ্ত করতে হয় চাপ দেয়ার কৌশল; আর আয়ত্তে আনতে হয় চাপ প্রয়োগের দক্ষতা।

৫. আকুপ্রেশার প্রয়োগের শুরুতে করণীয় কি ?

আকুপ্রেশার প্রয়োগের শুরুতে নাভিচক্র যথাস্থানে আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৬. নাভিচক্র কি ?

মানবদেহে নাভির পিছনে, মেরুদন্ডের সামনে একগুচ্ছ স্নায়ু। এরই নাম নাভিচক্র। নাভির নিচের সকল গ্রন্থিমালার নিয়ন্ত্রক এই নাভিচক্র।

যেহেতু নাভির নিচে হজম শক্তি থেকে শুরু করে সকল ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে সে কারণে নাভিচক্র সঠিক স্থানে আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। নাভিচক্র অনেক সময় উপরে অথবা নিচে সরে যায়।

৭. নাভিচক্র সরে যায় কেন ?

পেটে গ্যাস হলে অথবা ভারী কিছু উত্তোলন করলে নাভিচক্র সরে যায়।

৮. নাভিচক্র সরে গেলে কি সমস্যা হয় ?

* উপরে সরে গেলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়।
* নিচে সরে গেলে পাতলা পায়খানা হয়।
* মেয়েদের তলপেট ব্যথা হয়।
* বুকে ব্যথা হয়।
* দীর্ঘ দিন নাভিচক্র সরে থাকলে হজম ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

৯. নাভিচক্র যথাস্থানে আছে কিনা পরীক্ষা করার উপায় কি ?

প্রথমে দুই হাতের তালু পাশাপাশি রেখে চিত্র অনুযায়ী ১ নং রেখা দুটি এক সরল রেখা বরাবর মিলাতে হবে। নাভিচক্র ঐসময় যথাস্থানে থাকলে কড়ে আঙ্গুল দুটির উপরে চিত্রে দেখানো ৪ নং রেখা দুটিও এক সরল রেখায় মিলে যাবে।
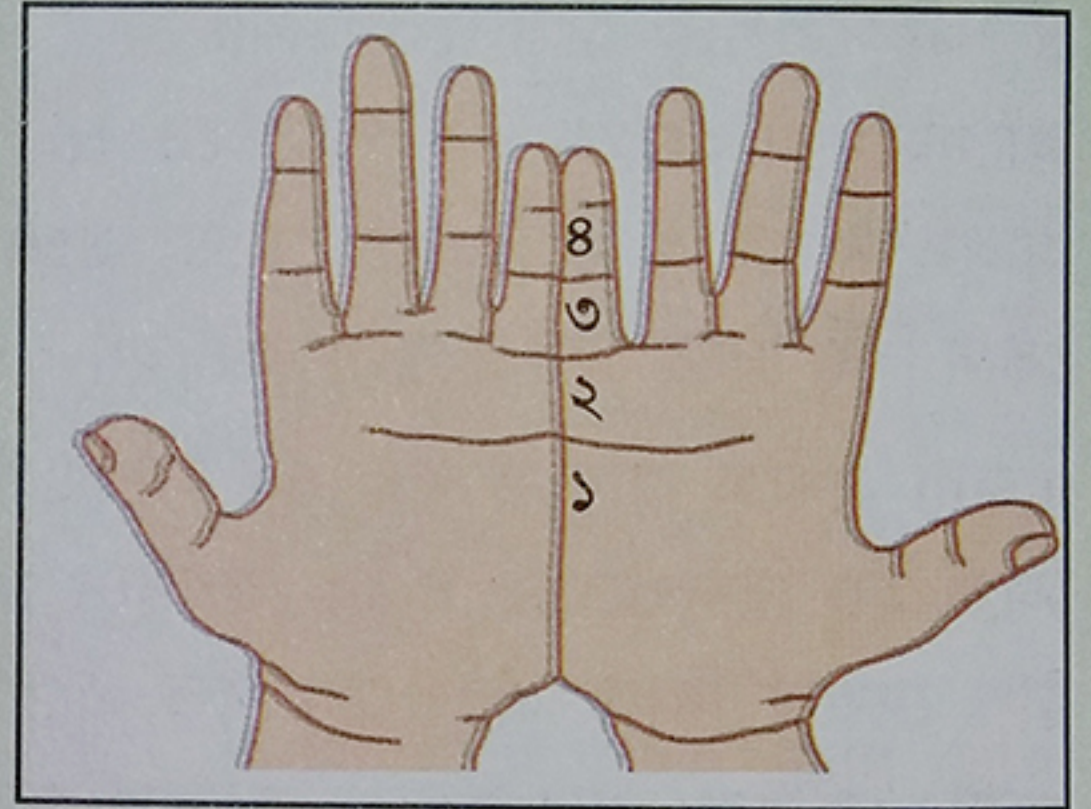
(চিত্র - ২১)

যদি নাভিচক্র যথাস্থানে না থাকে তাহলে উল্লিখিত ৪ নং রেখা দুটি মিলবে না, উপর-নিচ থাকবে।

১০. নাভিচক্র যথাস্থানে আছে কিনা পরীক্ষা করে তা কখন কখন ঠিক করতে হয় ?

সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এবং সন্ধ্যায় একই অবস্থায় নাভিচক্র পরীক্ষা করে যথাস্থানে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাতে হবে।

১১. নাভিচক্র ঠিক করার উপায় কি ?

(চিত্র - ২২)

প্রথমে ডান হাতের তালুটি (চিত্রের মতো করে) বাম হাতের কনুইয়ের ভাঁজে চেপে রাখতে হবে। এ সময় বাম হাতের মুঠো বন্ধ করে নিতে হবে। তারপর এক ঝটকায় বাম হাতটি উপরের দিকে তুলে আনতে হবে। এ পর্যায়ে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়ে কাঁধ স্পর্শ করতে হবে, অথবা স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। পরক্ষণেই বাম হাতটিকে আবার নামিয়ে প্রথম অবস্থায় আনতে হবে।
এই প্রক্রিয়াটি পরপর ৫ বার পুনরাবৃত্তি করলে নাভিচক্র যথাস্থানে চলে আসে।
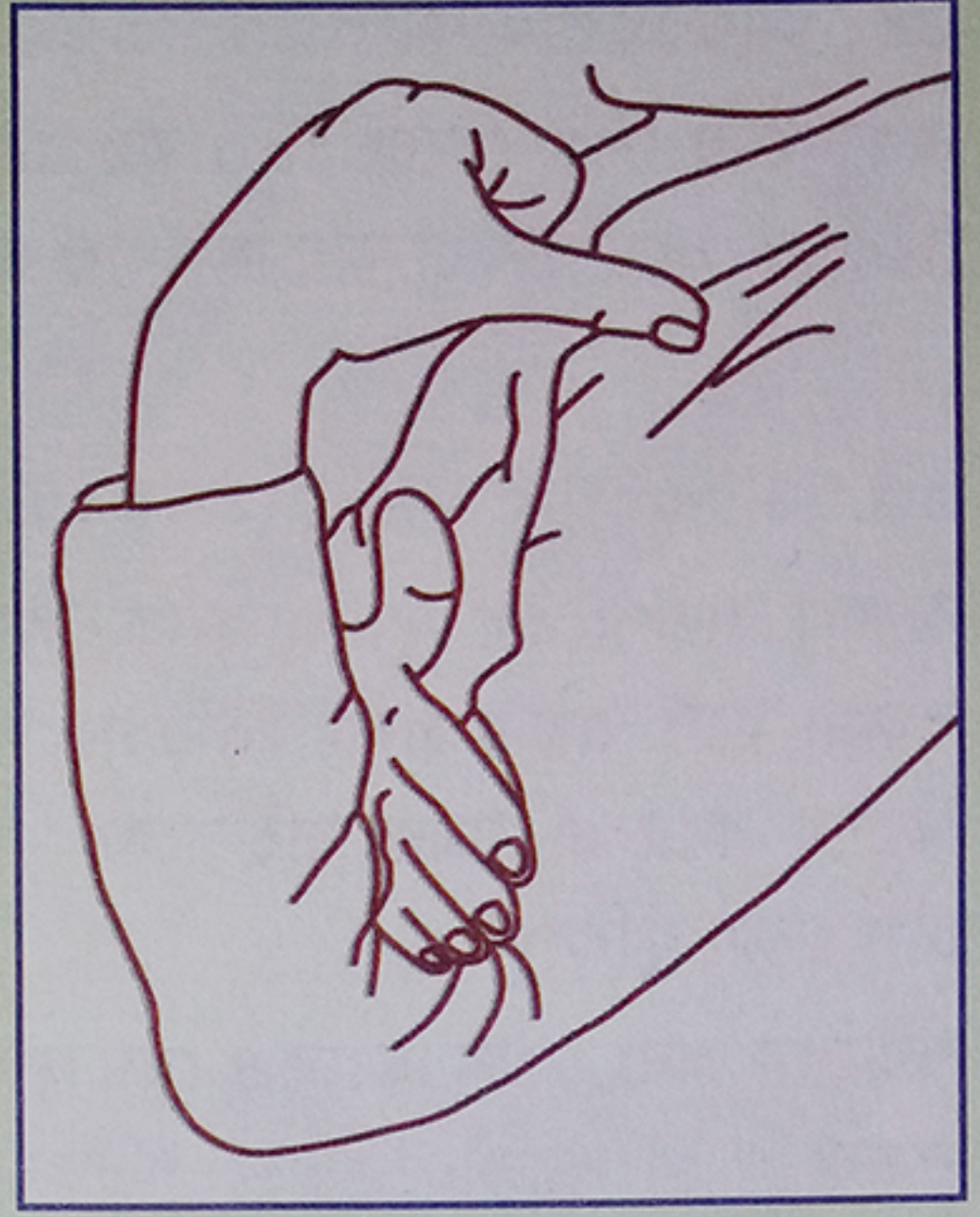
১২. পি পি বলতে কি বোঝায় ?

পি পি মানে পেইন পয়েন্ট (Pain Point)। করতল ও পদতলে অবস্থিত আকুপ্রেশারের কোন বিন্দুতে চাপ দিলে যে অংশে চাপ পড়া মাত্রই সূঁচ ফোটার মত ব্যথা অনুভূত হয় ঠিক ঐ অংশটিই হচ্ছে পি পি। কার্যকর উপচারের জন্য অর্থাৎ আকুপ্রেশারে রোগ নিরাময়ের জন্য সঠিক পি পি-তে চাপ দেয়াটা জরুরি।

১৩. আকুপ্রেশার প্রয়োগ করার নিয়ম কি ?

আকুপ্রেশার করার ক্ষেত্রে তিনটি নিয়ম পালন করতে হয়।

১. দিনরাত ২৪ ঘন্টায় তিন বারের বেশি আকুপ্রেশার করা যাবে না।

২. প্রতিবার আকুপ্রেশার করার সময় একই বিন্দুতে হাতে ২ মিনিট এবং পায়ে ৩ মিনিটের বেশি করা অনুচিত। সময় খেয়াল রাখতে না পারলে হাতে সর্বোচ্চ ১০০ বার এবং পায়ে সর্বোচ্চ ২০০ চাপ দেয়া যাবে। চাপ কোনক্রমেই অসহনীয় মাত্রায় এবং সেলাই মেশিনের মত অনবরত দেয়া যাবে না।

৩. খাওয়ার ১ ঘন্টার মধ্যে আকুপ্রেশার করা যাবে না। শুধু এই এক ঘন্টা সময়টুকু ছাড়া সুবিধামত বাকি যেকোন সময় পারলে ৩ বেলা না পারলে ২ বেলা কিংবা অন্ততপক্ষে ১ বেলা করা উচিত।

১৪. আকুপ্রেশার কাদের উপর প্রয়োগ করা যায় ?

একদিনের শিশু থেকে ১০০ বছরের বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের উপর আকুপ্রেশার চিকিৎসা প্রয়োগ করা যায় নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে।

১৫. আকুপ্রেশার কাদের উপর প্রয়োগ করা ঠিক নয় ?

অকাল গর্ভপাতের দুর্ভাগ্যজনক শিকার হওয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে পুনরায় গর্ভ সঞ্চার হলে অন্তত প্রথম তিন/চার মাস আকুপ্রেশার প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। বিশেষ করে এ সমস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে করতলের উল্টো পিঠে আকুপ্রেশারের চাপ দেয়া ঝুঁকিপূর্ণ।

শরীরের অন্য কোন অংশেও যেন অস্বাভাবিক বা লাগাতার চাপ না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকা দরকার। তবে গর্ভধারণের প্রথম ছয় থেকে আট সপ্তাহ সকলের ক্ষেত্রেই হাতের বিন্দুগুলোতে উপচার না করতে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারপর থেকে আর কোন সমস্যা নেই।

১৬. আকুপ্রেশার প্রয়োগ কখন ও কাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ?

অতিরিক্ত উচ্চ রক্তচাপের রোগী ও কঠিন স্নায়ুবিক সমস্যাগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে পিটুইটারি এবং পিনিয়াল গ্রন্থির বিন্দু দুটিতে উপচার করতে হবে খুবই সতর্কভাবে। এসব রোগীদের ক্ষেত্রে আচমকা জোরে চাপ দিলে রোগী জ্ঞান হারাতে পারে।

সেক্ষেত্রে অবশ্য আতঙ্কিত না হয়ে ধীরে ধীরে ৩ নং বিন্দুতে চাপ দিতে থাকলে আবারও জ্ঞান ফিরে আসবে।

১৭. আকুপ্রেশার প্রয়োগে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা যায় ?

আকুপ্রেশার প্রয়োগের জন্য মূলত ব্যবহার করতে হয় হাতের আঙ্গুল অথবা চাপ দেয়ার উপযোগী কোন ভোঁতা কাঠি বা কাঠি জাতীয় কিছু। এক্ষেত্রে পেন্সিলের ভোঁতা প্রান্ত অথবা কলমের পিছনের দিকের প্রান্তটিকেও ব্যবহার করা যায়। যেসব কলমের পিছনের অংশ মসৃণ ও অনেকটা মার্বেলের পিঠের মত গোলাকার সেসব কলম ব্যবহার করাটাই শ্রেয়।
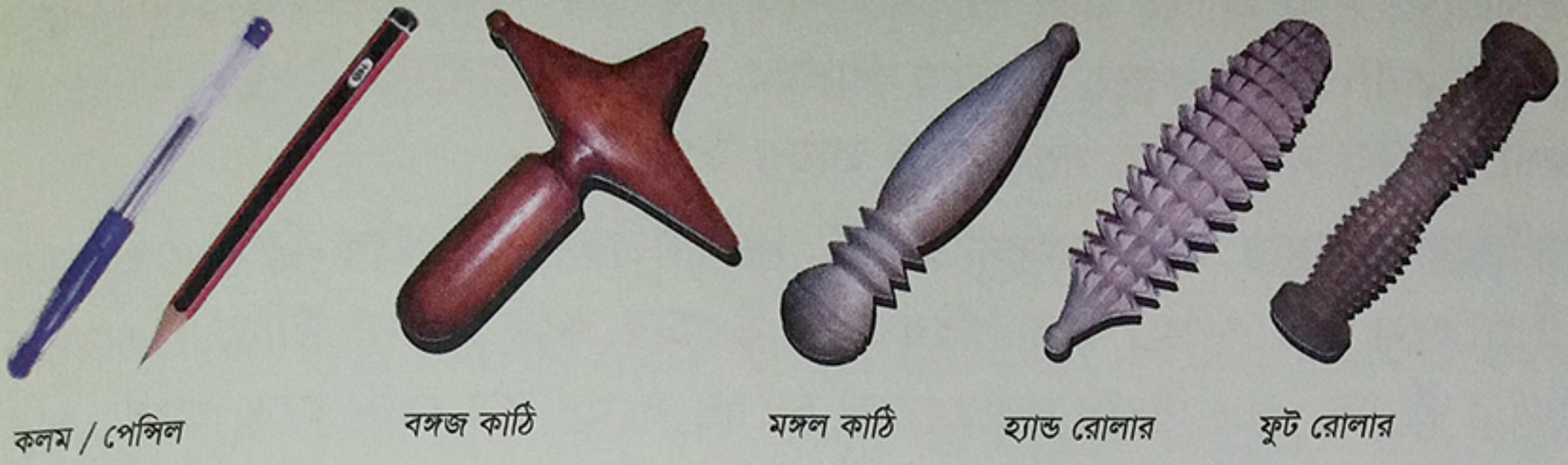
আকুপেশারে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ (চিত্র -২৩)

১৮. কোন্ বিন্দু দিয়ে চাপ শুরু করতে হবে ?

জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহের উৎপত্তি আঙ্গুলের ডগা থেকে হওয়ায় উপচার শুরু করতে হবে আঙ্গুলের ডগা থেকে এবং তারপর চাপ দিতে হবে অন্যান্য বিন্দুতে।

আঙ্গুলের ডগা বা সাইনাস বিন্দু দিয়ে চাপ শুরু করতে হবে। (চিত্র - ২৪)

১৯. সাইনাস বিন্দুতে কতটি চাপ দিতে হয় ?

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি সাইনাস বিন্দুতে ৪-৭ টি চাপ দিলেই যথেষ্ট। সাইনোসাইটিস রোগে যারা ভুগছেন সেসব রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ডগায় ২০-৩০টি চাপ এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যথাসম্বলিত আঙ্গুলের ডগায় ৫০ টি পর্যন্ত চাপ দেয়া যেতে পারে।

২০. একটি বিন্দুতে কতবার চাপ দিতে হয় ?

এই পদ্ধতিতে ব্যথা অনুভূত হওয়া প্রতিটি বিন্দুতে প্রতি বেলায় চাপ দিতে হয় সময়ের হিসেবে সর্বোচ্চ দুই মিনিট। গুনে গুনে দিলে হাতে সর্বোচ্চ ১৫০ বার এবং পায়ে ২০০ বার।

২১. কোন্ বিন্দুর পরে কোন্ বিন্দুতে চাপ দেয়া উচিত ?

বিন্দুগুলোতে ক্রমান্বয়ে চাপ দেয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বা সর্বসম্মত কোন নিয়ম নেই। এটা নির্ভর করছে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার উপর। উপচারের জন্য কতটুকু সময় দেয়া সম্ভব হচ্ছে তারও উপর।

শারীরিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটে থাকলে বিন্দু ১ থেকে বিন্দু ৩৭ পর্যন্ত (শিশু হলে ৩৮ পর্যন্ত) ধারাবাহিকভাবে উপচার করে যাওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ব্যথার তীব্রতা এবং বিন্দুর গুরুত্বভেদে চাপের সংখ্যা কম বেশি হতে পারে। যদি সময়ের স্বল্পতা থাকে সেক্ষেত্রে সাইনাস বিন্দু দিয়ে শুরু করে সরাসরি জরুরি বিন্দু, প্রয়োজনীয় বিন্দু এবং সহায়ক বিন্দু দিয়ে উপচার শেষ করা যেতে পারে।

২২. সবশেষে কোন বিন্দুতে চাপ দিতে হয় ?

(চিত্র - ২৫) (চিত্র - ২৬)

সবশেষে কিডনীর বিন্দু নং- ২৬ এ চাপ দিতে হবে।

আকুপ্রেশার করার পর সবশেষে যে বিন্দুটিতে চাপ দিতে হয় সেটি হচ্ছে, কিডনীর সুইচ ২৬ নং বিন্দু। এর কারণ হচ্ছে অন্যান্য বিন্দুতে উপচার করার পর সেসব বিন্দু সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে সৃষ্ট বিষাক্ত বর্জ্য ক্রমশ সরে গিয়ে কিডনীর মুখে উপস্থিত হয়।

সবশেষে কিডনীর উপচার করায় কিডনী সেসব বিষাক্ত বর্জ্য সহজেই বের করে দিতে পারে। ফলে সবশেষে ২৬ নং বিন্দু উপচার না করলে একসময় পুঞ্জিভূত বিষাক্ত বর্জ্যে কিডনী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিডনী হয়ে পড়ে সংকটগ্রস্ত।

২৩. চাপের মাত্রা কতটুকু হবে ?

চাপের মাত্রা হবে সহনীয়। কোন ক্রমেই অসহনীয় মাত্রায় চাপ দেয়া যাবে না।

২৪. দিনে রাতে কতবার আকুপ্রেশার করা যাবে ?

দিন রাত্রি ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোনক্রমেই তিনবারের বেশি আকুপ্রেশার করা যাবে না। দু'বার আকুপ্রেশারের মাঝে ছয় ঘন্টা বিরতি দিতে হবে।

২৫. চাপের সংখ্যা কখন কম, কখন বেশি হবে ?

একটি বিন্দুতে ব্যথা যখন নাম মাত্র বা কম হয় অর্থাৎ সমস্যাটা যখন প্রাথমিক অবস্থায় থাকে, তখন চাপ দিতে হবে বিন্দুর গুরুত্বভেদে ১০/২০ বা ৩০ বার। ব্যথার পরিমাণ যদি মাঝারি থাকে তাহলে চাপ দিতে হবে বিন্দু ভেদে ৩০-৫০ বা ৬০ বার। ব্যথা তীব্র হলে অর্থাৎ বিন্দুগুলোতে অল্প চাপেই অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হলে তখন চাপ দিতে হবে হাতের ক্ষেত্রে ৭০-১০০ বার এবং পায়ের ক্ষেত্রে ১৫০ বা ২০০ বার।

মাঝারি বা অধিক ব্যথার বিন্দুতে নিয়মিত চাপ দিয়ে যেতে থাকলে ২-৪ সপ্তাহের ব্যবধানে ব্যথার পরিমাণ কমে আসতে থাকবে ধীরে ধীরে। চাপের পরিমাণও তখন কমিয়ে আনতে হবে।

কোন বিন্দুতে ব্যথা সর্বোচ্চ মাত্রায় অর্থাৎ অসহনীয় পর্যায়ের হলে সাধারণ অবস্থায় হাতে চাপ দিতে হবে ১০০, পায়ে চাপ দিতে হবে ১৫০ বার। অনুভবে এবং অনুমানে ব্যথার মাত্রা যে পরিমাণ কম অনুভূত হবে চাপের সংখ্যাও ধীরে ধীরে সেই পরিমাণে কমিয়ে আনতে হবে।

২৬. কিভাবে চাপ দেয়া উচিত ?

আকুপ্রেশারে কোন ক্রমেই কোন বিন্দুতে একনাগাড়ে অর্থাৎ সেলাই মেশিনের মত চাপ দেয়া উচিত না। চাপ দিতে হবে থেমে থেমে। একটি চাপ থেকে আরেকটি চাপের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হওয়া উচিত ১-২ সেকেন্ড।

নতুন যারা অনুশীলনে যাবেন, তাদের জন্য ভাল হয় এভাবে গুনে চাপ দেয়া ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫............।

২৭. চাপ প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ বিন্দুতে বিশেষ বিশেষ মনোযোগের দরকার পড়ে কি ?

হাত এবং পা উভয় ক্ষেত্রে ১-৫, ৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ নং বিন্দুগুলোতে
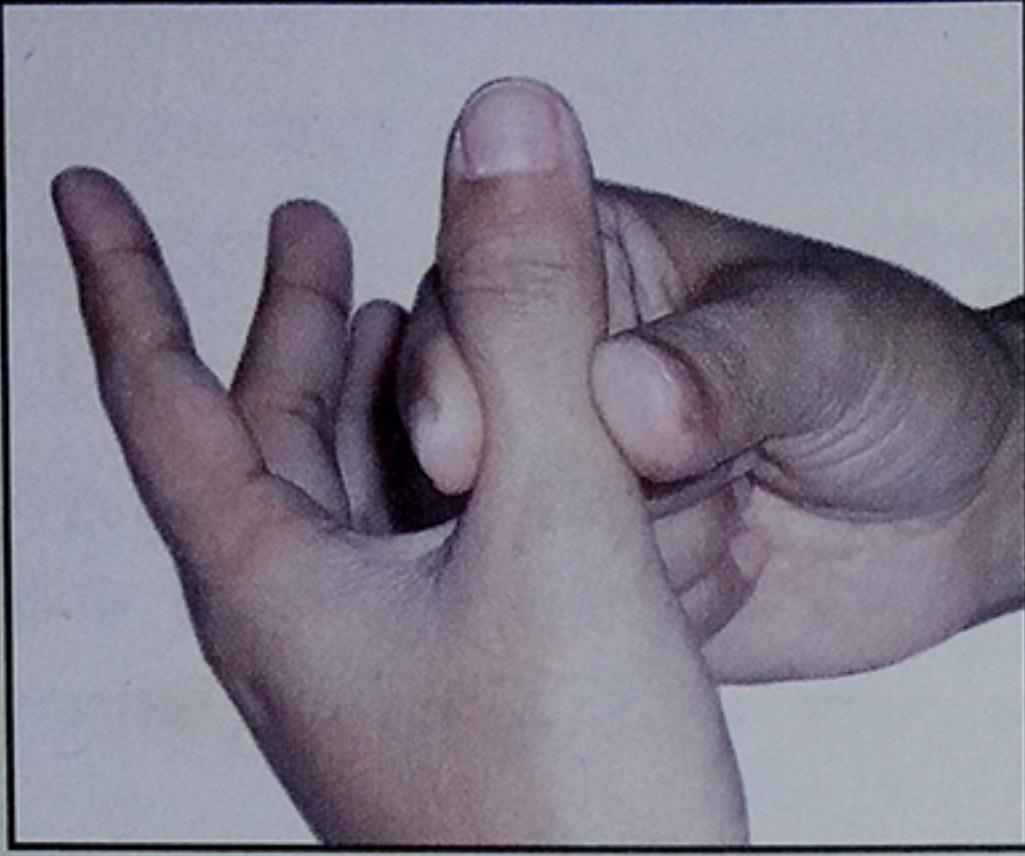
(চিত্র - ২৭) (চিত্র - ২৮)

আঙ্গুলের এপিঠ ওপিঠ দুদিকেই চাপ দিতে হয়। বিশেষ করে বিন্দু নং ২, ৫ ও ৭ – এ ব্যথা এপিঠ -ওপিঠ ছাড়াও দুপাশেও অনুভূত হয়। ৮ ও ৯নং বিন্দুগুলোর অবস্থান বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকায় পুরো এলাকা জুড়ে ১-২ দফা চাপ দিলে তবেই ব্যথার পয়েন্ট পাওয়া যায়।

২৮. ব্যথার পরিমাণ কমে আসা থেকে কি বোঝা যাবে ?

নিয়মিত চাপ প্রয়োগে ব্যথার পরিমাণ যত কমে আসতে থাকবে বোঝা যাবে স্বাভাবিক হয়ে আসছে জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ- অপসারিত হয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত বর্জ্য। আর সেক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ অর্থাৎ দেহের ব্যথা, বেদনা, কষ্ট কমে আসতে থাকবে।

এ সময় শারীরিক দুর্বলতা বা কাহিল অবস্থা কিংবা অচলাবস্থা কাটতে থাকবে একই সঙ্গে, বলা যায় একই হারে। যার অর্থ দাঁড়াবে রোগের ক্রমাগত নিরাময়।

২৯. ব্যথা একেবারেই না থাকলে করণীয় কি ?

কোন বিন্দুতে যখন আর ব্যথা একেবারেই থাকবে না, তখন সে বিন্দুতে চাপ দেয়ার কার্যত আর কোন আবশ্যকতা নেই। এক্ষেত্রে কেবল রোগ প্রতিরোধ তথা রোগের পুনরাাবির্ভাব রোধে সাধারণ বিন্দুগুলোতে ৩-৫ বার, গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুগুলোতে ১০-১৫ বার চাপ দেয়া যেতে পারে বা দিতে পারলে উত্তম।

৩০. আকুপ্রেশার প্রয়োগে সতর্কতা কি ?

১. প্রতি ২৪ ঘন্টায় উপচার করা যাবে তিন বেলা এবং হাতের প্রতিটি বিন্দুতে সর্বাধিক ১০০-১৫০ বার এবং পায়ের ক্ষেত্রে বড়জোর ২০০ বার, সময়ের হিসাবে উভয় ক্ষেত্রে দুই মিনিট।

২. খাওয়ার পর পরই আকুপ্রেশার করা যাবে না। ভারী খাওয়ার এক ঘন্টা পরে উপচার করা যাবে। তবে টুকটাক বা হাল্কা খাবারের ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানার বাধ্যবাধকতা নেই।

৩. অসহনীয় মাত্রায় বা প্রচন্ড জোরে অনবরত অনেকক্ষণ বা অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একনাগাড়ে কোন বিন্দুতে চাপ দেয়া যাবে না। অথবা দ্রুত ভাল হয়ে যাবার জন্য সারাদিনই বা বার বার একটি বিন্দুতে নিয়ম ভেঙ্গে উপচার করা যাবে না।

এতে সুইচটি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তেমনি বিন্দু সংশ্লিষ্ট চামড়া ও মাংসপেশীর উপরে এবং ভিতরে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। করতল ও পদতলের উপরের আবরণের বিন্দু -সংশ্লিষ্ট অংশ শক্ত হয়ে যেতে বা তাতে দাগ বসে যেতে পারে।

৩১. এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত ?

অসাবধানতা, অজ্ঞতা বা ভুলবশত এরুপ ঘটে গেলে ঐ বিন্দুতে উপচার সাময়িক বন্ধ রাখা উচিত বা কোন কাঠি ব্যবহার না করে ম্যাসেজ করে দেয়া যেতে পারে কিছুদিন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পরেও আরও কয়েক সপ্তাহ সেখানে কাঠি ব্যবহারে বিরত থাকাটাই সঙ্গত।

৩২. চলতে ফিরতে বসতে, কথা বলতে বলতে আকুপ্রেশার করা যায় কি ?

চলতে-ফিরতে-বসতে বা কথা বলতে বলতেও আকুপ্রেশার প্রয়োগ করা যায় এবং এতে অনেকটা সুফলও পাওয়া যাবে। গাড়ীতে, রিক্সায়, বাসে, ট্রেনে বসে এমনকি নিরাপদ সতর্ক অবস্থানে থেকে হাঁটতে হাঁটতেও হাতের বিন্দুগুলোতে থেরাপি দেয়া সম্ভব।

সেক্ষেত্রে শুধু মনে রাখতে হবে একটি বিন্দুতে যেন তিন বেলার অধিক চাপ দেওয়া না হয়। আবার প্রতিটি বিন্দুতে যেন সর্বোচ্চ ১৫০ বারের বেশি চাপ না পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে যে দ্রুত পরিপূর্ণ সুফল পেতে চাইলে পরিপূর্ণ উপচারের বিকল্প নেই।

৩৩. এতে কি পরিপূর্ণ সুফল পাওয়া যাবে ?

এতে পরিপূর্ণ সুফল পাওয়া যাবে না। এমনকি পূর্ণ সুফল পাওয়ারও কথা নয়। আংশিক বা কষ্ট লাঘব হওয়ার মতন সুফল পাওয়া সম্ভব। তার চেয়েও বড় কথা এর দ্বারা তিনবেলা বা দুইবেলা কিংবা নিদেনপক্ষে প্রতিদিন একবেলা বিন্দুগুলোতে উপচার করার ধারাবাহিকতাটা অব্যাহত রাখা যায় যা পূর্ণ সুফল লাভের জন্য একটি অত্যাবশ্যক শর্ত।

বিষয়টিকে একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে এভাবে বুঝানো যায়, সারা দিন বা দুইদিন ধরে ক্ষুধার্ত মানুষকে এক টুকরো বিস্কিট অথবা এক থালা ভাতের সাথে আলু ভর্তা খেতে দিলে তার ক্ষুধার জ্বালা তাৎক্ষণিক কিছুটা বা অনেকটা নিবৃত্ত হবে। দীর্ঘ সময়ের অভূক্তিজনিত কারণে নিস্তেজ হয়ে থাকা শরীরে বল ফিরে আসবে কিছুটা বা অনেকটা। চলতে-ফিরতে বা হাঁটতে-হাঁটতে করা উপচারেও সেরূপ সুফল পাওয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে, একই মানুষকে সাময়িক সময়ের জন্য বা লাগাতার পরিপূর্ণ সুষম খাদ্যের যোগান দিলে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে তার প্রভাবটি যেমন হবে, পরিপূর্ণ উপচারে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ঘটবে।

৩৪. শিশুদের ক্ষেত্রে ঘুমানোর সময় কি আকুপ্রেশার করা যায় ?

শিশুদের ক্ষেত্রে ঘুমানোর সময় আকুপ্রেশার করতে কোন বাধা নেই। তবে ঘুমের সময় চাপ এমন ভাবে দিতে হবে যাতে শিশুর ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

৩৫. রোগ ভাল হচ্ছে কিনা কি করে বুঝব ?

নির্ধারিত নিয়ম ধরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ক্রমাগত উপচার করে গেলে করতল ও পদতলে সংশ্লিষ্ট বিন্দুগুলোর পি পি-তে যখন ব্যথা কমে আসতে থাকবে তখনই বুঝা যাবে রোগ ভাল হয়ে আসছে ক্রমশ। পি পি-তে ব্যথা কমার সঙ্গে সঙ্গে রোগ সেরে ওঠার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে রোগের উপসর্গগুলো দূর হয়ে যাওয়া। পি পি-তে যখন কোনই ব্যথা পাওয়া যাবে না তখন স্বাভাবিকভাবে রোগের সব উপসর্গও আর থাকে না; রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

৩৬. কোন কোন ক্ষেত্রে হাতের বিন্দুর ব্যথা চলে যায় কিন্তু পায়ের বিন্দুর ব্যথা থাকে সেক্ষেত্রে কি করণীয় ?

সেক্ষেত্রে হাতের ব্যথা চলে যাওয়ার পর পায়ের ব্যথার বিন্দুগুলোতে উপচার চালিয়ে যাওয়া দরকার।

৩৭. বার্ধক্য প্রতিরোধ ও তারুণ্য বজায় রাখার বিন্দু কোন্‌টি ?

বার্ধক্য প্রতিরোধ ও তারুণ্য বজায় রাখার বিন্দু। (চিত্র - ২৯)

আগেই বলা হয়েছে জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ দেহের ডান হাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সূচিত হয়। এর কেন্দ্রবিন্দু থাকে ডান হাতের কনুই ও কব্জির মাঝখানে হাতের ভেতরের অংশে। একে মেইন সুইচও বলা যায়। কনুই ও কব্জির ঠিক মাঝখানে ১ ইঞ্চি মাপের বৃত্তের মধ্যে এটি অবস্থিত। এই বিন্দুতে ২ মিনিট অবিরাম চাপ দিলে দেহের মধ্যে তারুণ্য বজায় থাকে এবং বার্ধক্য প্রলম্বিত করা যায়। চল্লিশোর্ধ্ব প্রতিটি নর-নারীর দিনে ৩ বার ২৬ নং বিন্দুতে উপচারের আগে এই মেইন সুইচটিতে ২ মিনিট করে লাগাতার চাপ দেয়া অবশ্য কর্তব্য।
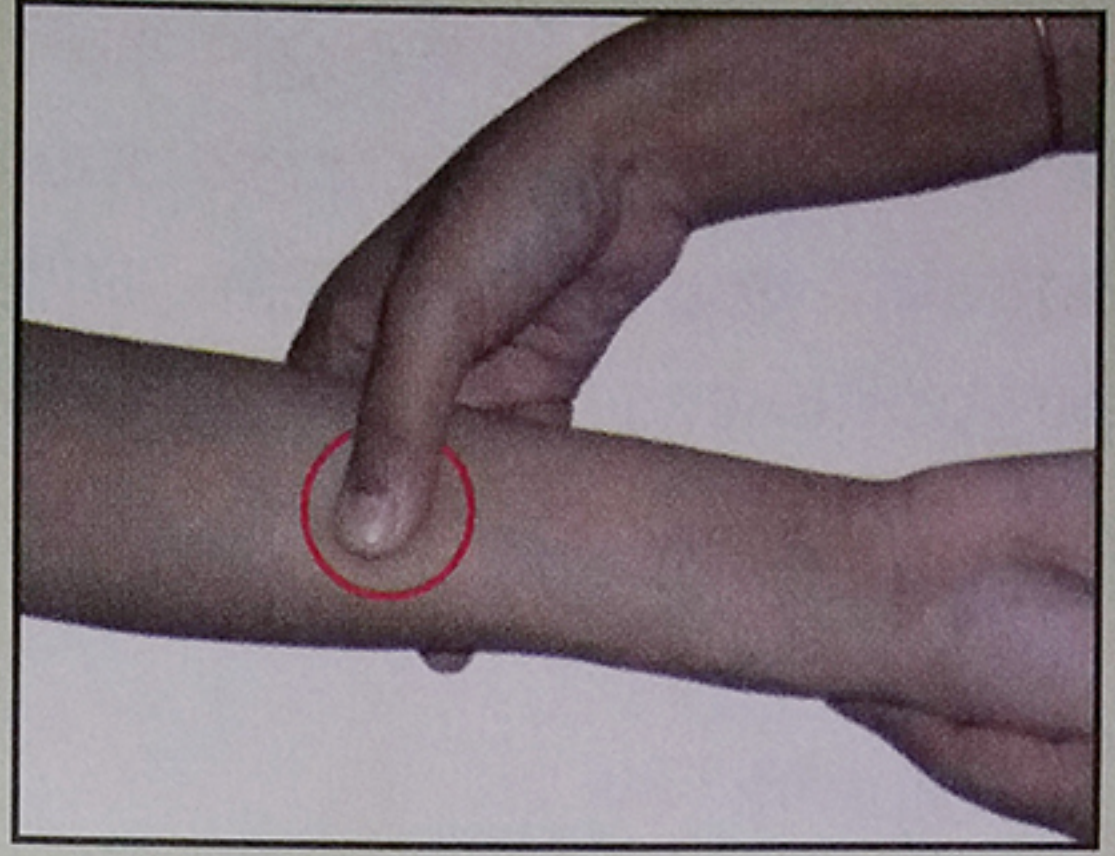
৩৮. আকুপ্রেশারে রোগ ভাল হতে কতদিন সময় লাগে ?

আকুপ্রেশার পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রোগ ভাল হতে কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে রোগের মাত্রা বা তীব্রতা, রোগের মেয়াদ, রোগীর বয়স এবং আকুপ্রেশার এর নির্ধারিত নিয়ম মত পরিপূর্ণ উপচার চালিয়ে যাওয়ার উপর। একই সঙ্গে রোগ সৃষ্টির পেছনে দায়ী যে কারণগুলো সক্রিয় থাকে সেসব কারণ দূর করার ওপর। এসব কারণের মধ্যে বিশেষ করে সুস্থতা পরিপন্থী খাদ্যাভ্যাস ও রোগসৃষ্টি সহায়ক চিন্তাভ্যাস এবং ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত ও নতুন রোগ সৃষ্টি সহায়ক ঔষধ নির্ভরতা -এই তিনটি থেকে বেরিয়ে আসার শর্ত অন্যতম।

তবে বেশ কিছু শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সুফল পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে মাথা ব্যথা, দাঁতের ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, পেটে ব্যথা জাতীয় নৈমিত্তিক শারীরিক সমস্যাসমূহ।

এছাড়া সাধারণত রোগভেদে তিন সপ্তাহ থেকে তিন মাসের মধ্যে ছোট বা মাঝারী কঠিন ও জটিল রোগ থেকে আকুপ্রেশারের মাধ্যমে রেহাই পাওয়া যায়। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা পুরাতন রোগ বা শরীরের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি একযোগে আক্রান্ত অবস্থায় থাকলে এবং বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের বেলায় এসব ক্ষেত্রে সুস্থ হতে আরও বেশি সময় লাগে।

৩৯. গুরুত্বভেদে বিন্দুর শ্রেণীকরণ করা যায় কি ?

ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব শারীরিক সমস্যার নিরিখে তার ক্ষেত্রে বিন্দুর গুরুত্বের তারতম্য হতে বাধ্য। ফলে ব্যক্তির রোগভেদে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আকুপ্রেশার-এর নির্দিষ্ট বিন্দুগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়।

এই শ্রেণী তিনটি হচ্ছে :

* জরুরি বিন্দু
* প্রয়োজনীয় বিন্দু
* সহায়ক।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লিভারের সমস্যায় যিনি ভুগছেন তার জন্য জরুরি বিন্দু হচ্ছে ২৩ নং বিন্দু, প্রয়োজনীয় বিন্দু হচ্ছে ২৮ ও ২২ নং বিন্দু এবং সহায়ক বিন্দু হচ্ছে ২৭ ও ৩ নং বিন্দু।

৪০. ফুট রোলার ও হ্যান্ড রোলার নিয়মিত ব্যবহারের উপকারিতা কি?

* ক্লান্তি, অবসাদ ও অনিদ্রা দূর হয়।
* মেদ বা চর্বি কমাতে এবং উচ্চতা বাড়াতে সহায়তা করে।
* পায়ের গোড়ালী, হাঁটু, কোমর ও পিঠের ব্যথা ও গাঁটের যন্ত্রণা নিরাময়ে সহায়তা করে।
* সায়াটিকাজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যা দূর করে।
* হজমের সমস্যা কাটাতে এবং গ্যাস ও এসিডিটি দূর করতে সহায়তা করে।
* হজম শক্তি বৃদ্ধি করে।
* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে সহযোগিতা করে।
* হার্ট, কিডনী ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

ব্যবহারের বিধি :

ফুট রোলার : একটি চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে ফুটরোলারটি পায়ের নিচে রাখতে হবে। তারপর হালকা চাপ দিতে দিতে আঙ্গুল থেকে গোড়ালী পর্যন্ত রোলিং করুন।

হ্যান্ড রোলার : দুই করতলের মাঝে হ্যান্ডরোলারটি নিয়ে রোলিং করুন।

উভয়টি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ১০ হতে ১৫ মিনিট করতে হবে।

পরিচ্ছেদ -৪

আকুপ্রেশার প্রয়োগের কৌশল

পরিচ্ছেদ সূচি

১. সহনীয় চাপের কৌশল কি?

সহনীয় চাপ দেয়ার কৌশল আয়ত্তে আনার পূর্বশর্ত হচ্ছে, আচমকা বা হঠাৎ করে কোন বিন্দুর উপর চাপ দেয়ার প্রবণতা ও অভ্যাস পরিহার করা। প্রথমেই আঙ্গুল বা কাঠি দিয়ে বিন্দুর উপরের চামড়া স্পর্শ করতে হয়। তারপর তাতে চাপ দিতে হয় ধীরে ধীরে। এভাবে চাপের প্রয়োগে অসহনীয় ব্যথার বিন্দুগুলিতে সহনীয় ব্যথায় চাপ দেয়া সম্ভব হয়।

২. ব্যথার বিন্দু (পিপি) চিহ্নিত করার উপায় কি?

বলা হয়ে থাকে, শরীরের কোন অংশে চাপ দিলে ব্যথা তো পাওয়া যাবেই। বিশেষ করে আঙ্গুলে জোরে চাপ দিলে বা কাঠি দিয়ে দিলে তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে রোগ নির্ণয় ও সহায়ক বিন্দুর ব্যথাটিকে আলাদা করা যাবে কি করে?

এর সহজ যৌক্তিক উত্তরটি হচ্ছে-স্বাভাবিক চাপের ব্যথা (প্রচন্ড জোরে না দিলে) হয়ে থাকে সহনীয়, অসহ্যকর নয় মোটেও। অপরদিকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিতে গোলযোগজনিত কারণে যে ব্যথা পাওয়া যায় চাপের ফলে তা অসহনীয় অনুভূত হয়।

রহস্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় চলাফেরায় বিদ্যমান লুক্কায়িত এ ব্যথা মোটেও অনুভূত হয় না ব্যক্তিটির কাছে। এটি কেবল ধরা পড়ে চাপ দেয়া হলে। এরূপ ব্যথাতে চাপ পড়া মাত্রই অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হবে।

এর প্রকাশ ঘটে চাপ পড়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট হাত বা পা ব্যথার ফলে আপনা থেকেই ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে; স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাত বা পা-টি সরে আসে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে ব্যক্তিটি। খুব বেশি সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরও এরূপ ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে ব্যথায় কুঁচকে আসে চোখ-মুখ, বিশেষ করে চোখের পাপড়ি।

উপচার নিজে করতে গেলে এসব বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়া ব্যথার অনুভূতি থেকেও পিপি শনাক্ত করা সম্ভব। আর অন্যের উপচার করতে গেলে চাপের প্রতিক্রিয়াজনিত উল্লিখিত লক্ষণ থেকেই ধরা পড়ে পিপি'র অবস্থান।

৩. পি পি কি এক জায়গায় থাকে না স্থান বদলায়?

অজ্ঞাত কারণে একই বিন্দুতে একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পি পি এক জায়গায় পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাত ও পায়ের বিন্দু নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯ এবং পায়ের ১৯, এমনকি ২৫ ও ২৮ নং বিন্দুগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রোগের পুন:আবির্ভাবের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এসব বিন্দুতে একই ব্যক্তির একই বিন্দুর পি পি ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। ব্যক্তিভেদেও পিপি-র এই ভিন্ন অবস্থান প্রায়শই দেখা যায়।

৪. উপচারের জন্য কোন্ কোন্ আঙ্গুল ব্যবহার করা যায়?

চাপ দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর সঙ্গে মধ্যমা ব্যবহার করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। কখনো কখনো অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীও কাজে লাগানো যায়।
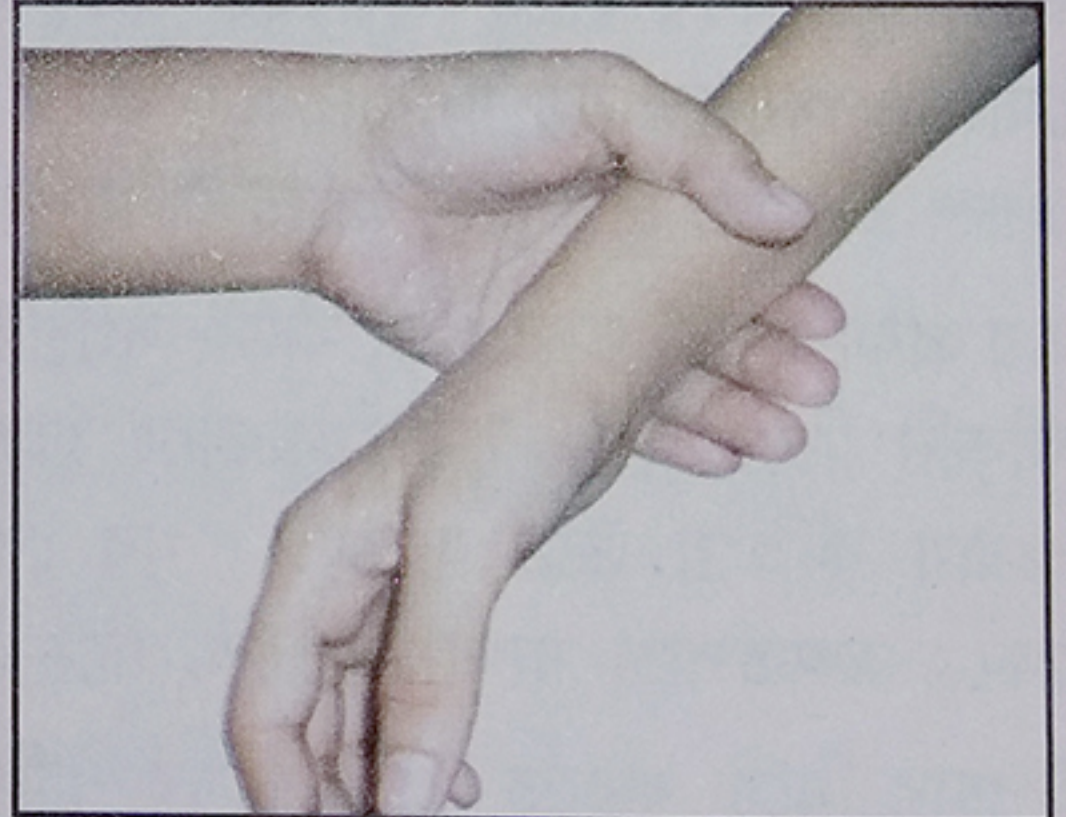
(চিত্র - ৩০) (চিত্র - ৩১) (চিত্র - ৩২) (চিত্র - ৩৩)

উপচারে বিভিন্ন আঙ্গুলের ব্যবহার।

৫. শিশুদের ক্ষেত্রে আঙ্গুল বা কাঠি এর কোন্‌টি ব্যবহার করা যায়?

শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আট বছর বয়স পর্যন্ত উপচারের ক্ষেত্রে শুধুই আঙ্গুল ব্যবহার করাটাই শ্রেয়। ক্ষেত্র বিশেষে কিশোর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ, চৌদ্দ-পনের বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে হাতের বিন্দুগুলোর উপচারেও আঙ্গুল ব্যবহার করা শ্রেয়।

এক্ষেত্রে পায়ে ১৯নং বিন্দুটির ক্ষেত্রে কাঠি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।

৬. বৃদ্ধ এবং অতিরিক্ত ব্যথা সম্বলিত বিন্দুর ক্ষেত্রে আঙ্গুল বা কাঠি এর কোনটি ব্যবহার করা উচিত?

অনেক বয়স্ক মানুষ, বিশেষ করে সত্তর উর্ধ্ব বয়স্কদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এসব বয়সের নারীদের ক্ষেত্রে হাতের বিন্দুগুলির উপচারে আঙ্গুল ব্যবহার করাটাই উত্তম। পায়ের ১৯, ২৫ ,২৮, ২২, ২৩, ৩৬, ৩৭ এবং কারো কারো পা অধিক নরম না হলে ২০, ২৭, ২৯ নং বিন্দুগুলোতেও কাঠি বা কাঠি জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে হয়।

বয়স্ক মানুষগুলোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রোগের মাত্রা গভীর ও ব্যাপক হওয়ায় তাদের রোগ সংশ্লিষ্ট বিন্দুগুলোতে সাধারণ চাপেই অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়। সেক্ষেত্রে ঐ সব বিন্দুতে প্রথমে চেষ্টা চালানো উচিত আঙ্গুল দিয়ে উপচার করা। চাপকাঠি জাতীয় কিছু ব্যবহার করলেও চাপটা দিতে হবে ধীরে ধীরে।

৭. হাতের কোন্ বিন্দুগুলোতে কাঠি ব্যবহার করতে হয়?

শিশু ও অধিক বয়স্ক ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সাইনাস বিন্দু এবং বিন্দু নং ১, ৩, ৪, ৮, ১৮ – এই বিন্দুগুলোতে কার্যকর সুফল পেতে হলে সাধারণত কাঠি ব্যবহার করতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ৯ নং বিন্দুতেও কাঠি ব্যবহার করা যায়।

৮. হাতের কোন্ বিন্দুগুলোতে কেবল আঙ্গুল ব্যবহার করা শ্রেয়?

বিন্দু নং ২, ৫,৭, ৯, ১১-১৬,২৯, ৩১, ৩৫, ৩৮ – এ আঙ্গুল ব্যবহার করাই উত্তম, এমনকি অধিকতর কার্যকর।

৯. পায়ে কোন্ কোন্ পয়েন্টে কাঠি ব্যবহার করতে হয়?

সাইনাস বিন্দু এবং বিন্দু নং ১, ৩, ৪, ৮, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ –এ কাঠি ব্যবহার করতে হয়।

১০. পায়ের কোন্ বিন্দুগুলোতে কেবল আঙ্গুল ব্যবহার করা শ্রেয়?

বিন্দু নং ২, ৫,৭, ৯, ১১-১৫, ৩২, ৩৩, ৩৪, সাইটিকা ও নার্ভাল পয়েন্ট (ঘচ) –এ কেবল আঙ্গুল ব্যবহার করা শ্রেয়। তবে পায়ের ক্ষেত্রে ২ এবং ৫ নং বিন্দুতে সতর্কতার সাথে অনেক ভোঁতা কিম্বা প্রায় গোলাকার মাথার কাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে ৩২, ৩৩, ৩৫ নং বিন্দুতেও ধীরে ধীরে কাঠি ব্যবহার করা যায়। দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে পারলে পায়ের ৬, ১৭, ১৮, ২৪, ৩১, ৩৫ নং বিন্দুতেও কাঠি ব্যবহার করা যায়।

১১. বুড়ো আঙ্গুল ব্যবহারের কৌশল কি?

বুড়ো আঙ্গুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর ৪টি অংশকে উপচারের কাজে লাগানো যায়।
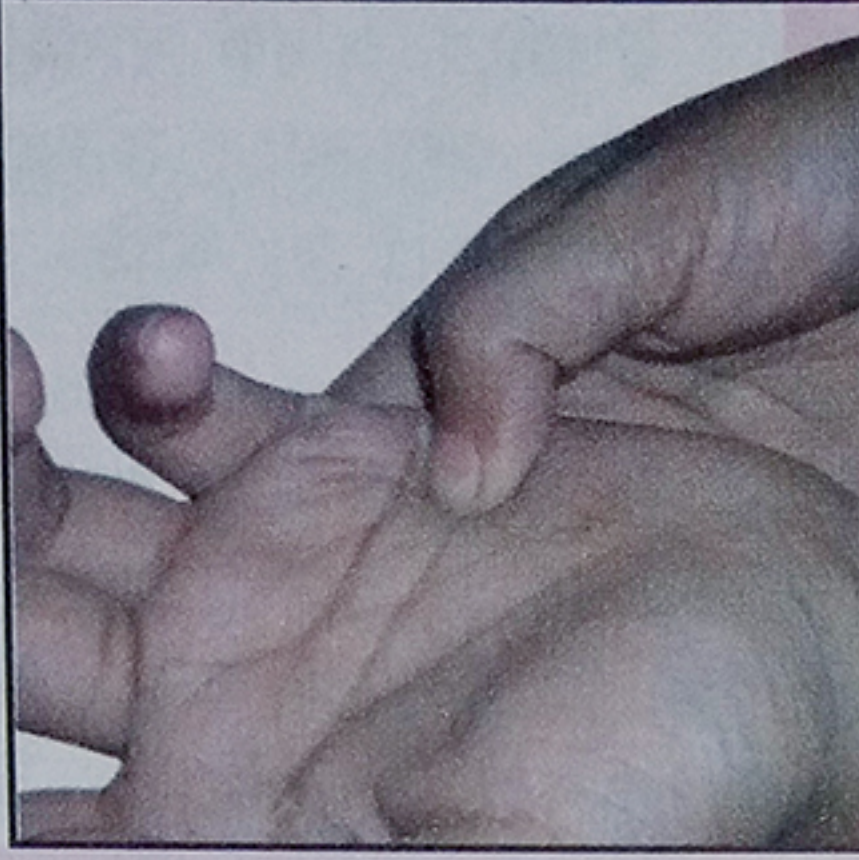
(চিত্র নং-৩৪) (চিত্র নং-৩৫)
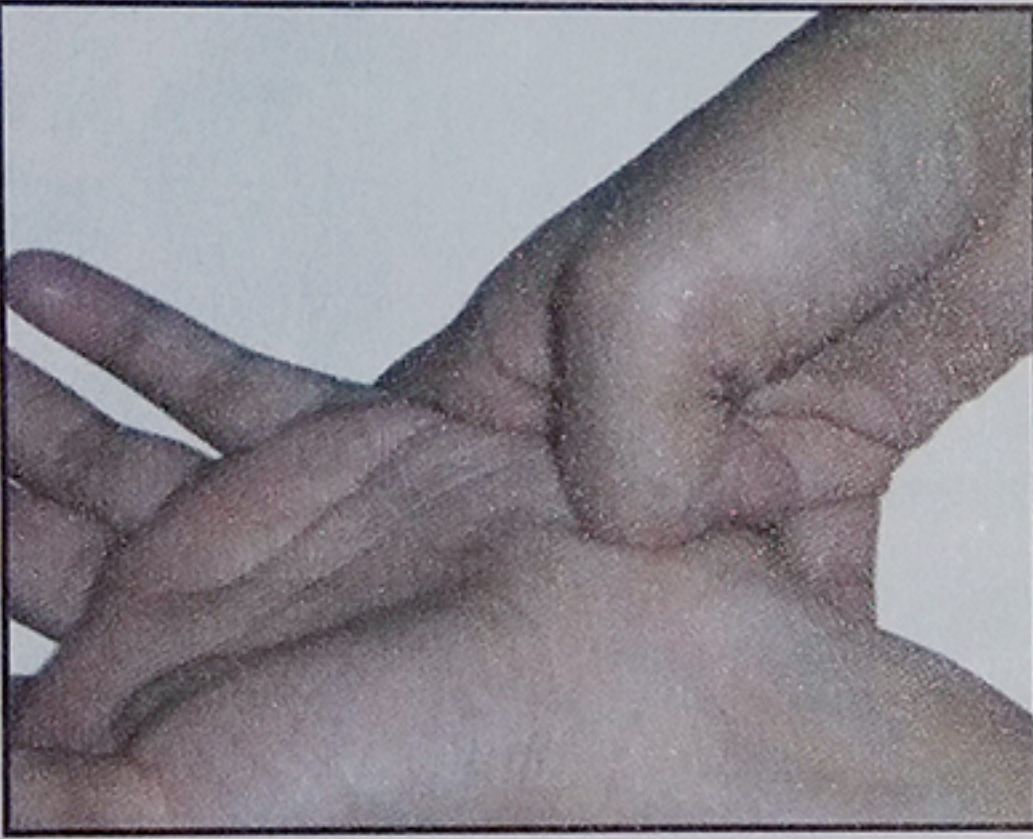
(চিত্র নং-৩৬) (চিত্র নং-৩৭)

বুড়ো আঙ্গুলের বিভিন্ন ব্যবহার।

এক; নখ সন্নিহিত অংশকে খাড়াভাবে ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নখের আঘাত না লাগে, নখ কেটে রাখলে তার আশংকা কম থাকে। (চিত্র-৩৪)

দুই: বুড়ো আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজের উপরের দিকে টিপসই দেয়ার অংশকে উপচারে ব্যবহার করা যায়। (চিত্র-৩৫)

তিন: প্রথম ভাঁজটির উল্টোপিঠ বাঁকালে যে মোটা প্রান্তটি বেরিয়ে আসে সেটিকে কাঠির ভোঁতা মাথার মতো ব্যবহার করে তাকে উপচারের কাজে ব্যবহার করা যায়। (চিত্র-৩৬)

চার: এছাড়া প্রথম ভাঁজের ভেতরের অংশকেও উপচারের কাজে লাগানো যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার সাহায্য নিতে হয়। (চিত্র-৩৭)

১২. শিশুদের উপচারের জন্য বুড়ো আঙ্গুলকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়?

বুড়ো আঙ্গুলের প্রথম অংশটি দিয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে সাইনাস, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১-১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ নং বিন্দুতে সহজেই উপচার করা যায়।

বুড়ো আঙ্গুলের দ্বিতীয় অংশটি ব্যবহার করে হাত ও পায়ের ২, ৫, ৮, ১১-১৫, ১৬, ১৯ এবং হাতের ২৯, ৩১-৩৫ নং বিন্দুতে সহজেই কার্যকরভাবে উপচার করা যায়।

শিশুদের ক্ষেত্রে তর্জনী ও মধ্যমাকে বুড়ো আঙ্গুলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় সহজেই।

অপরদিকে, বুড়ো আঙ্গুলের ৩য় অংশ দিয়েও প্রয়োজনে হাতের ১, ৩, ৪, (৩ ও ৪ -এর উল্টো অংশ) ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৩১-৩৫, ৩৬, ৩৭ নম্বর বিন্দু উপচার করা যায়।

১৩. পায়ে উপচারে কোন্ কোন্ আঙ্গুল ব্যবহার করা যায়?

শিশুদের ক্ষেত্রে পায়ের উপচারে প্রধানত বুড়ো আঙ্গুলের চারটি অংশই ব্যবহার করা যায়। সেই সঙ্গে বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে সহায়ক হিসেবে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা ব্যবহার করা যায় এবং বুড়ো আঙ্গুলের বিকল্প হিসেবে কখনো কখনো তর্জনী এবং অনামিকাও ব্যবহার করা যায়।

অপরদিকে পায়ের ৩, ৪–এর উল্টোপিঠ এবং ২, ৫ ও ৭ নং বিন্দু বুড়ো আঙ্গুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ দ্বারা, বিন্দু নং ৬–কে বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে যৌথভাবে, বিন্দু নং ৯–এর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বুড়ো আঙ্গুলের তৃতীয় অংশ অথবা তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে ব্যবহার করা যায়।

এছাড়া পায়ের ১১-১৫ উপচারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিন্দু নং ১২, ১৪ ও ১৫ বুড়ো আঙ্গুলের ৩য় অংশ দ্বারা খুবই কার্যকরভাবে চাপ দেয়া যায়। ১২ ও ১৩ নং বিন্দুতে বুড়ো আঙ্গুলের ৪র্থ অংশ দ্বারা চাপ দেয়া যায় অনায়াসে।

অপরদিকে বিন্দু নং ৩১-৩৫ বিশেষ করে ৩২, ৩৩, ৩৪ নম্বর বিন্দুগুলি অপর ৪টি আঙ্গুলের সহযোগিতায় বুড়ো আঙ্গুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ দ্বারা কার্যকরভাবে চাপ দেয়া যায়। এক্ষেত্রে বুড়ো আঙ্গুলের ১ম অংশও ব্যবহার করা যায়।

বুড়ো আঙ্গুলসহ অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা ৩১ ও ৩৫ নং বিন্দুতে চাপ দেয়া যায়।

এক্ষেত্রে বুড়ো আঙ্গুলের ১ম অংশও কারো কারো ক্ষেত্রে ৩১ ও ৩৫ নং বিন্দুতে চাপের জন্য ব্যবহার করা হয়।

১৪. কোন বিন্দুতে ব্যথার পয়েন্ট একটি না একাধিক থাকে?

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সাধারণত একটি বিন্দুতে একটি ব্যথার পয়েন্ট থাকলেও কোন কোন বিন্দুতে ব্যথার পয়েন্ট অর্থাৎ পি পি একাধিক পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে একই সঙ্গে অথবা পর্যায়ক্রমে অপর পি পি গুলোতেও উপচার চালিয়ে যেতে হবে। সাধারণত একাধিক পি পি থাকা বিন্দুগুলো হচ্ছে ৮, ৯, নার্ভাল এবং সায়াটিকা বিন্দু।

১৫. পি পি ধরে চাপের বিশেষ নিয়ম কি?

পি পি শনাক্ত হওয়ার পর রোগ নিরাময় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উপচারের প্রধান করণীয় হচ্ছে পি পি -এর উপর চাপ দেয়া। এক্ষেত্রে প্রতি ১০ টি চাপের মধ্যে ৬-৭টি চাপ পি পি-র উপর এবং তার পরেই ৩-৪টি চাপ পি পি-র আশেপাশে দেয়া দরকার।

পরে আবারও একই হারে পি পি-র উপর এবং তারপরে পি পি-র আশেপাশে পালা করে দিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে অধিক ব্যথার বিন্দুতে প্রতি ৩০-৩৫ টি চাপের পর হাতের আঙ্গুল দিয়ে বিন্দুটি কয়েক সেকেন্ড ম্যাসাজ করে নিয়ে তারপর আবার শুরু করলে ভাল হয়।

১৬. আকুপ্রেশারে দ্রুত ও নিশ্চিত সুফল পাওয়ার উপায় কি?

এই পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত ও নিশ্চিত সুফল পাওয়ার সহজ পথ হচ্ছে নিজের উপচার নিজে করা এবং তা প্রতি ২৪ ঘন্টায় (দিন-রাত) তিনবার করা।

১৭. পরিপূর্ণ উপচার বলতে কি বোঝায়?

আকুপ্রেশার চিকিৎসাটি একটি ঐশ্বরিক চিকিৎসা। দৈব জ্ঞানলব্ধ সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, দরবেশ এই চিকিৎসা পদ্ধতি মানব সমাজে প্রচলন করেন। ঐশ্বরিক শক্তি লাভের অত্যাবশ্যক পথ হচ্ছে ঈশ্বর সংযোগ।

আর ঈশ্বর সংযোগের প্রধান উপায় হচ্ছে একাগ্রতা, এক-এ মগ্নতা, একরৈখিকতা। অপর কথায় যাকে বলা যায়, ধ্যান-মগ্নতা, ধ্যানগ্রস্ততা। মনোনিবেশ, মনোসংযোগ, মনোযোগ হচ্ছে ধ্যানের একমাত্র পথ।

পরিপূর্ণ উপচার তখনি হয় যখন একজন নিজের উপচার করার জন্য প্রথমেই বেছে নেবে উপচারের নির্ধারিত সময়টিকে একান্ত করে। আলাপচারিতা, ফোনে

কথা বলা থেকে বিরত থেকে মনকে নিবদ্ধ করে নিতে হবে দেহের রোগের উপর।

যখন যে বিন্দুতে চাপ দেয়া হবে তখন ঐ বিন্দুসংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গ্রন্থির গোলযোগে সৃষ্ট শারীরিক কষ্টগুলো মনে ভাবনায় নিতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি চাপ দেয়ার সময় এবং দেয়ার পর পরই দেহের ব্যথা এবং চাপের ফলে দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনুভবে নিতে হবে।

এক্ষেত্রে শুরুটা করা যেতে পারে চাপ দেওয়ার সময় ১-২-৩ গুনে গুনে। পাশাপাশি একই সাথে বা ধীরে ধীরে গোনার সময় গোনার সংখ্যাটিকে চোখে দেখার চেষ্টা চালানো উচিত। পরে অভ্যস্ত ও আয়ত্তে আসা সাপেক্ষে ১০০ থেকে বা ৪০ থেকে উল্টোভাবে গুনে গুনে চাপ দেয়ার অভ্যাস করা যেতে পারে।

এপর্যায়ে পারলে একই সঙ্গে বা পরে অর্থাৎ উল্টো গোনা রপ্ত করার পর উল্টো গুণে চাপ দেয়ার সময় সংখ্যাটি চোখে দেখে চাপ দেয়ার অভ্যাস আনা যেতে পারে। আর এভাবেই মনোযোগ, মনোসংযোগ, পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করা যাবে আকুপ্রেশারে –যা ধীরে ধীরে সহায়ক হয়ে উঠবে ধ্যানাভ্যাসের।

১৮. কার্যকর উপচার অর্থাৎ ফলপ্রসূ আকুপ্রেশারের কৌশল কি?

আকুপ্রেশার করতে গিয়ে প্রথম জরুরি কাজটিই হচ্ছে যে বিন্দুতে চাপ দিতে হবে প্রথমেই তার ব্যথার অংশ পি পি খুঁজে নেয়া। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আকুপ্রেশারে প্রতিটি সুইচ বা বিন্দু বলতে ঠিক কোন বিন্দুই বোঝায় না। একেকটি বিন্দু আসলে পরিমাপের এককে এক ইঞ্চি, আধা ইঞ্চি, ১/৩ ইঞ্চি বা কম হলেও ১/৪ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে অবস্থান করে।

আকারে তা গোলাকার, অর্ধগোলাকার, প্রায় ত্রিকোণাকৃতির, বর্গাকার ও ক্ষেত্র বিশেষে আয়তাকার স্থান জুড়ে থাকে। এছাড়া মেরুদন্ডের বিন্দুর ক্ষেত্রে হাতে প্রায় ২ ইঞ্চি এবং পায়ে প্রায় ৪ ইঞ্চির মতো অংশ জুড়ে থাকে।

অপরদিকে, হাত এবং পায়ে থাইরয়েড বিন্দুটি এবং পায়ে ১৯ নং বিন্দুও স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে বড় অংশ নিয়ে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে কার্যকর উপচার নিশ্চিত করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় বিন্দুটির পি পি চিহ্নিত করে নেয়া এবং এই পি পি ধরে যথানিয়মে উপচার চালিয়ে যাওয়া।

পরিচ্ছেদ-৫

বিন্দু ও বিন্দু সংশ্লিষ্ট গ্রন্থি-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচিতি

পরিচ্ছেদ সূচি

বিন্দু পরিচিতি ঃ

সাইনাস (Sinus): হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের ডগা ।
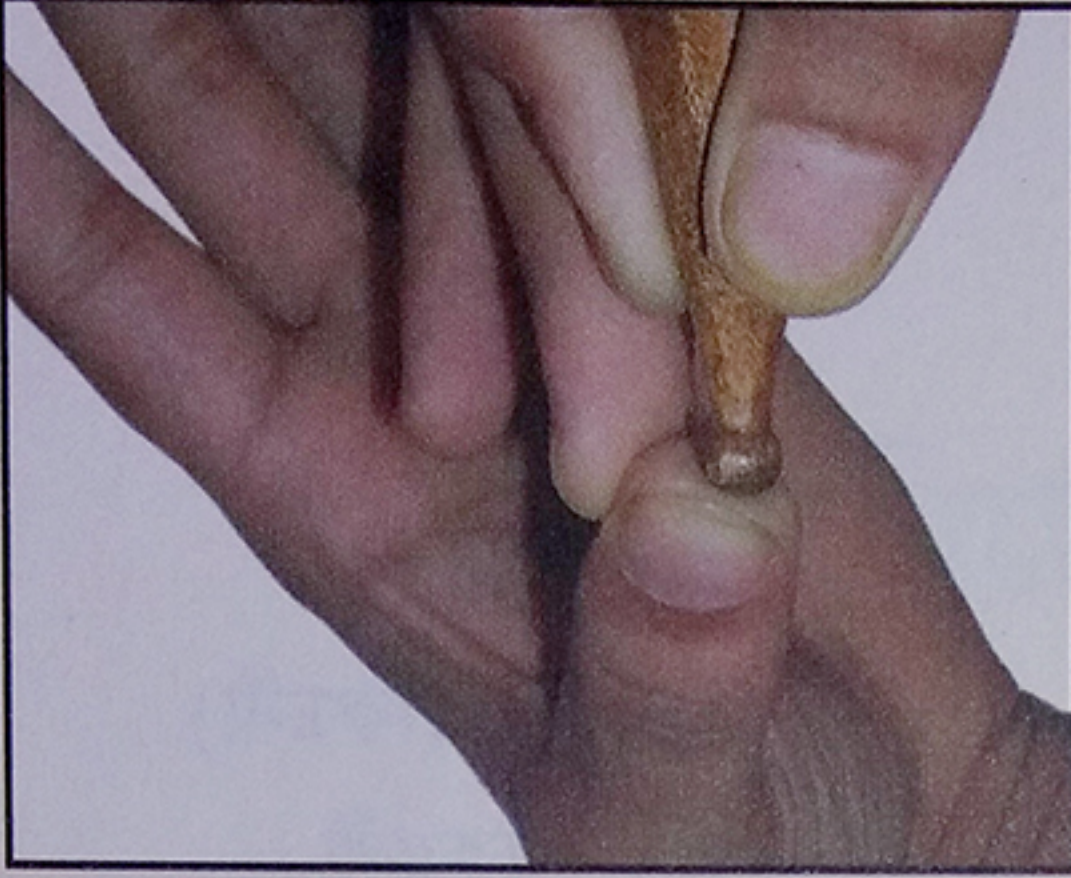
(চিত্র - ৩৮)

(চিত্র - ৩৯)

নাকের দু'পাশে, উপরে ও পেছনে নিরেট হাড়ের ভিতরে যে গর্তগুলো থাকে সেগুলোকে একত্রে নাসিকা পার্শ্বস্থ গহ্বরসমূহ (Paranasal Sinuses) বা সংক্ষেপে সাইনাস বলে । এই গহ্বরগুলো কণ্ঠস্বরের অনুরণনে সাহায্য করে এবং একইসঙ্গে মাথা ও মুখ মন্ডলের ওজন হ্রাস করে । এগুলো নাকের সাথে ছিদ্র দ্বারা সংযুক্ত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে ।

সমস্যা ঃ

নাকের সর্দিতে এই গহ্বরগুলোতেও শ্লেষ্মা জমে এবং অনেক সময় নাকের সংযোগ পথ বন্ধ হয়ে শ্লেষ্মাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।

সাইনাসগুলোর অবস্থান হচ্ছে :

১. নাকের দু'পাশে দুটি ম্যাক্সিলারী সাইনাস (Maxillary Sinuses)

২. নাকের উপরে কপালে দুটি ফ্রন্টাল সাইনাস (Frontal Sinuses)

৩. নাকের পেছনে মাথার খুলির ভেতরে দুটি স্ফেনয়ডেল সাইনাস (Sphenoidal Sinuses)

৪. নাকের গোড়ায় চোখের ভেতরের কোণে একগুচ্ছ করে ইথময়ডেল সাইনাস (Ethmoidal Sinuses)

বিন্দু নং-০১ : মস্তিষ্ক (Brain)

(চিত্র - ৪০)

(চিত্র - ৪১)

মস্তিস্ক শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মস্তিস্কই জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার। একে স্বয়ংক্রিয় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন যন্ত্র ও সুপার কম্পিউটার এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সাথে তুলনা করা চলে।

আমাদের শরীরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে কোমল, তাই এটি হাড় দ্বারা এত বেশি সুরক্ষিত। এটি একটি কোমল আবরণ দ্বারা আবৃত। বাইরে মাথার খুলি, তার বাইরে পরপর তিনটি চর্মের আবরণ, সবার বাইরে মাথার চুল। পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের মস্তিষ্কের ওজন দেড় কেজি।

কাজ ঃ

মস্তিস্কে অসংখ্য স্নায়ু থাকে। যখন রক্ত এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়, তখন জৈব বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের ব্যাটারি শক্তি উত্তেজিত করে, শরীরের অভ্যন্তরীন কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্বারা বিভিন্ন পেশী সঞ্চালন, হাঁটা, দৌড়ানো, দেহ ভঙ্গিমা এবং ভারসাম্য বজায় থাকে। মস্তিস্ক পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত সকল অনুভূতি, পূর্বজ্ঞান স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে।

উপসর্গ / লক্ষণ / সমস্যাসমূহঃ

* মাথা ব্যথা/ মাইগ্রেন
* মাথা ঘোরা
* স্মরণশক্তি দুর্বলতা
* জ্ঞানলোপ
* খিঁচুনি

বিন্দু নং-০২ মস্তিষ্কের স্নায়ু : (Cranial Nerves)
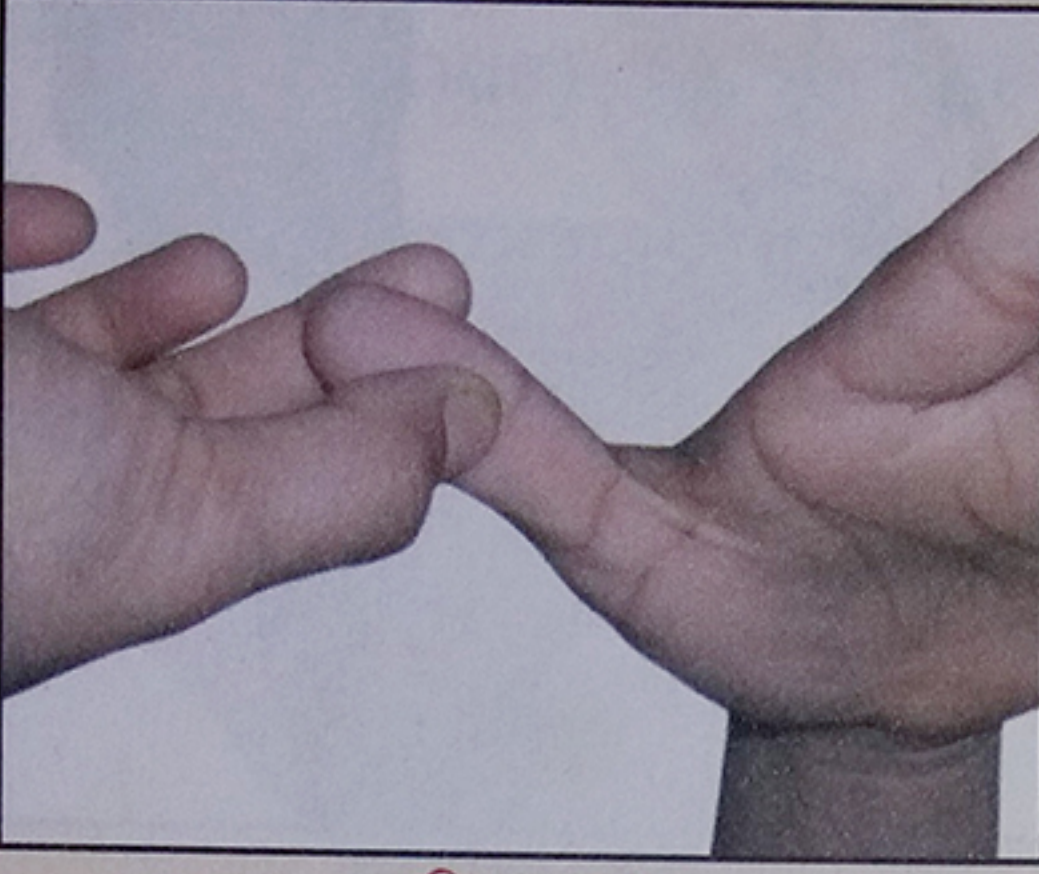
(চিত্র - ৪২)

(চিত্র - ৪৩)

দেহ রাজ্যের যেকোন অংশে যা কিছু কাজ সম্পন্ন হয় তার খবর স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিস্কে পৌঁছায়। মস্তিস্কের স্নায়ুমন্ডলীর সূক্ষ্ণজাল সারা দেহে বিস্তৃত যার মধ্য দিয়ে সারা দেহের সঙ্গে মস্তিস্ক যোগাযোগ রাখে। মস্তিস্ক স্নায়ুর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ অঙ্গে পাঠাতে পারে।

দুই পাশের (বাম ও ডান) স্নায়ু বিপরীত দুই দিকের অঙ্গকে নির্দেশ পাঠায়। ফলে ডান পাশের স্নায়ু শরীরের বাম দিকের অঙ্গ পরিচালনা করে, আর বাম দিকের স্নায়ু শরীরের ডান দিকের অঙ্গ পরিচালনা করে।

সমস্যা ঃ

প্রয়োজনীয় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ না হলে, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের ফলে স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। এক পর্যায়ে মস্তিস্কের সাথে দেহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে পড়ে।

বিন্দু নং-০৩ : পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary Gland)

(চিত্র - ৪৪)
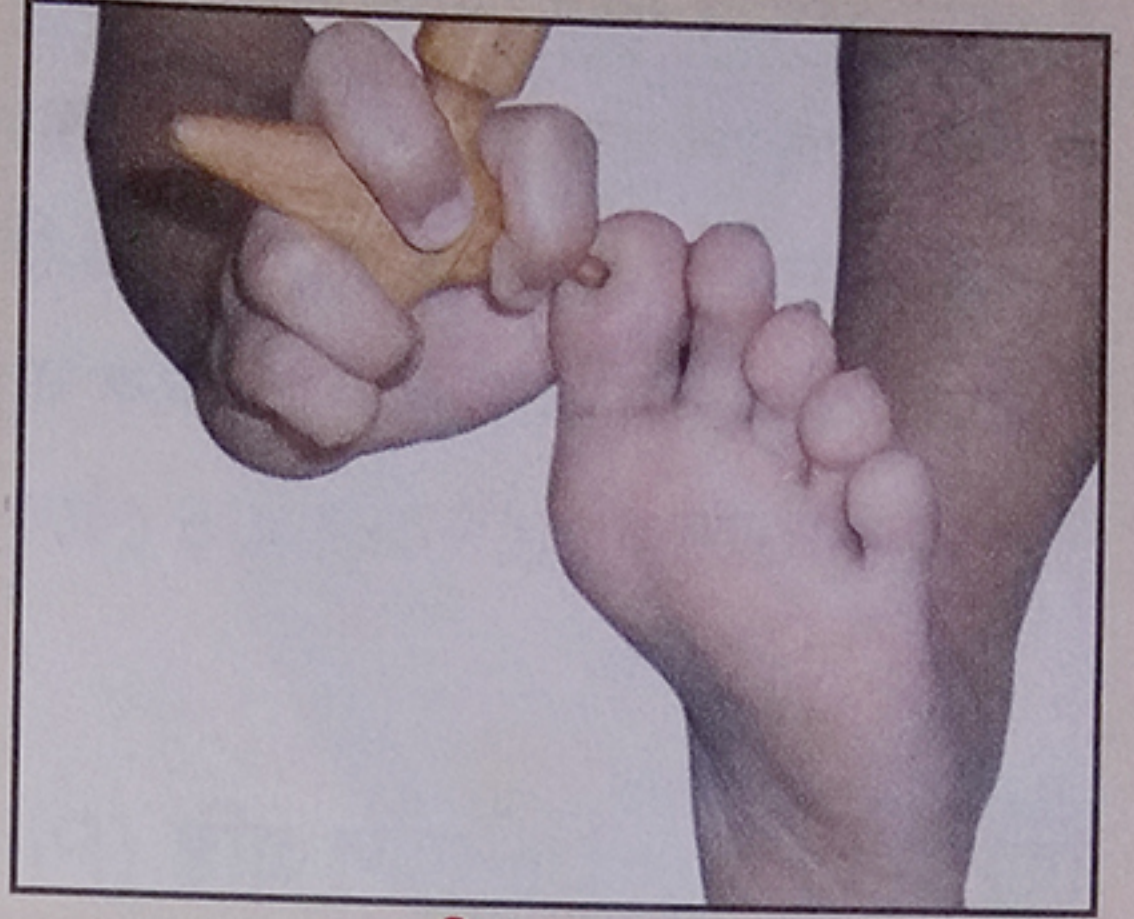
(চিত্র - ৪৫)

পিটুইটারী গ্রন্থি মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত। এটি মস্তিষ্কের সঙ্গে একটি বোঁটা দ্বারা যুক্ত থাকে। মস্তিষ্কের সাথে এর সংযোগ রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। এই গ্রন্থিকে সকল অন্ত:স্রাবী গ্রন্থির রাজা বা Master of Endocrine gland বলা হয়। এর কারণ হল এটি সব গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ ঃ

* মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও বিচার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।
* মন ও বুদ্ধি বিকাশ পরিচালনা করে।
* এই গ্রন্থি ঠিকমত কাজ করলে মানুষ বিরাট প্রতিভাবান বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী ও মানব প্রেমী হয়ে ওঠে।

সমস্যা ঃ

এই গ্রন্থিতে সমস্যা থাকলে-

* দেহ বৃহদাকার হয়ে যেতে পারে।
* শিশুদের ক্ষেত্রে উৎপীড়ন করা, অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা কথা বলা, এমন কি চুরির অভ্যাসও দেখা দেয়।
* প্রসবের পরে অস্বাভাবিক স্থুলত্বের/ মোটা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
* অন্ত:সত্ত্বা থাকাকালীন অবস্থায় পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুর জন্ম হতে পারে।

* ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় ।
* যৌন ক্ষমতা কমে যেতে থাকে ।
* ত্বক খসখসে হয় এবং গর্ত হয়ে যায় ।
* পুরুষদের চুল, দাঁড়ি, গোঁফ প্রভৃতি ঠিকমতো গজায় না ও পুরুষত্ব আসে না ।
* বয়স অনুযায়ী বুদ্ধিমত্তা ঠিক থাকে না ।
* লম্বা ব্যক্তিদের মেরুদন্ডের হাড় বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

বিন্দু নং-০৪ : পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal Gland)

(চিত্র - ৪৬)
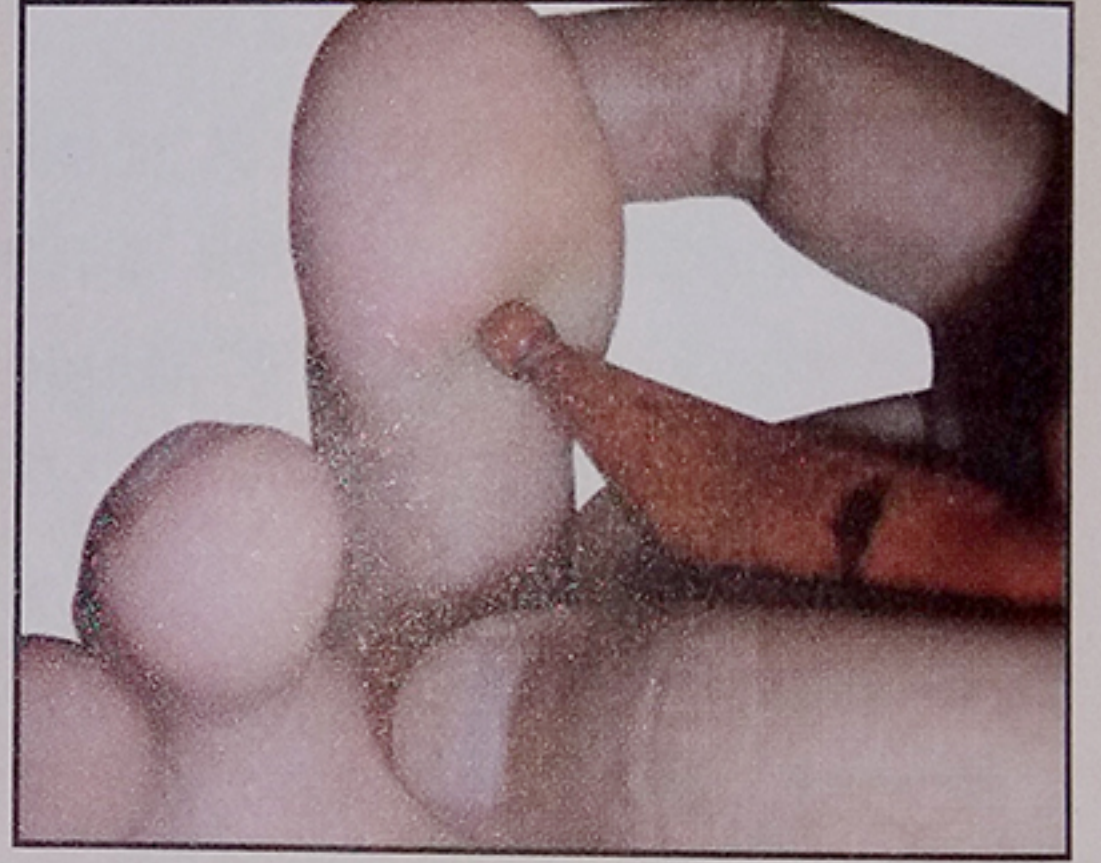
(চিত্র - ৪৭)

কাজ ঃ

এই গ্রন্থি অন্যান্য গ্রন্থির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে । মানব দেহের পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের ভারসাম্য রক্ষা করে । অন্য সব গ্রন্থি সুঠাম, মজবুত ও সুস্থ রাখে । মানুষকে সাধু প্রকৃতির ও মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন করে তোলে । মানুষ ধীমান ও দয়ালু হয় । ইচ্ছা শক্তি জোরালো হয় এবং দৈহিক কষ্ট বা দুঃখে অবিচল থাকতে সাহায্য করে ।

সমস্যা ঃ

* উচ্চ রক্তচাপ ।
* অকালে যৌন দোষ ।
* দেহে তরল পদার্থের আধিক্য ঘটে, যার ফলে হাত পায়ে পানি জমে । একে কিডনীর অসুখ বলে ভুল করা হয় ।

বিন্দু নং-০৫ : মাথার শিরা (Head Veins)
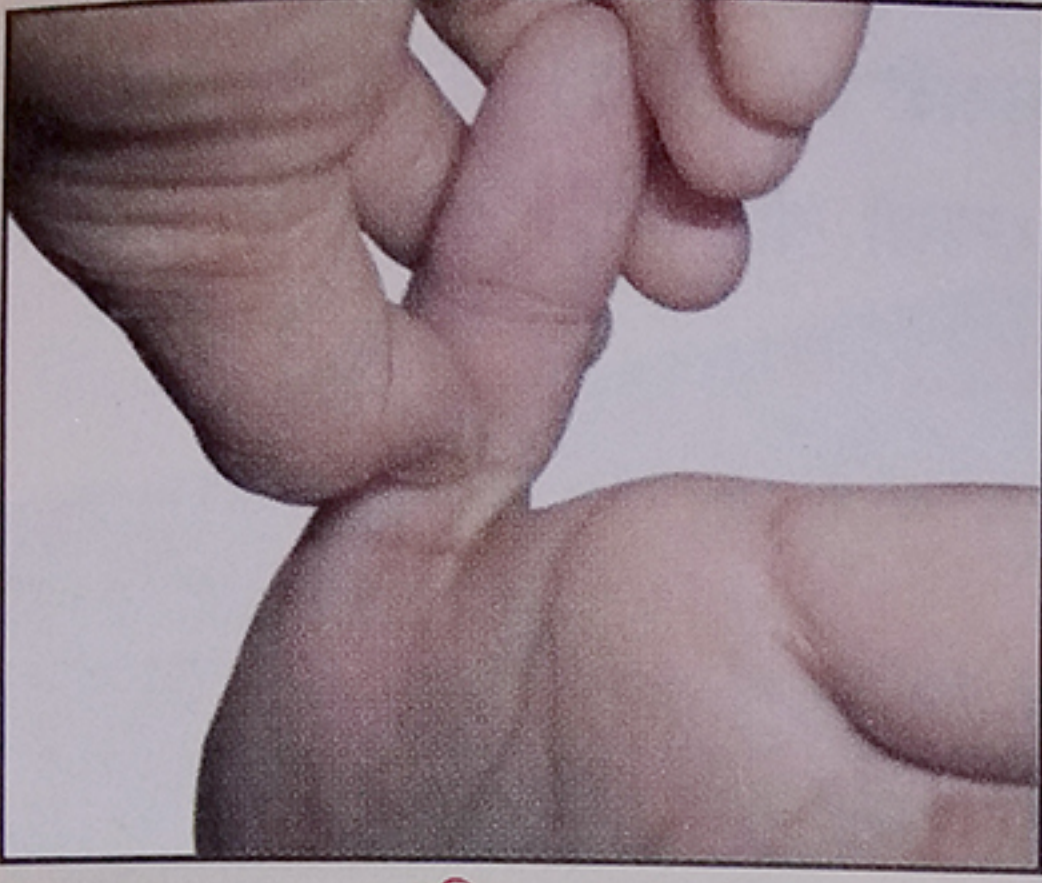
(চিত্র - ৪৮)
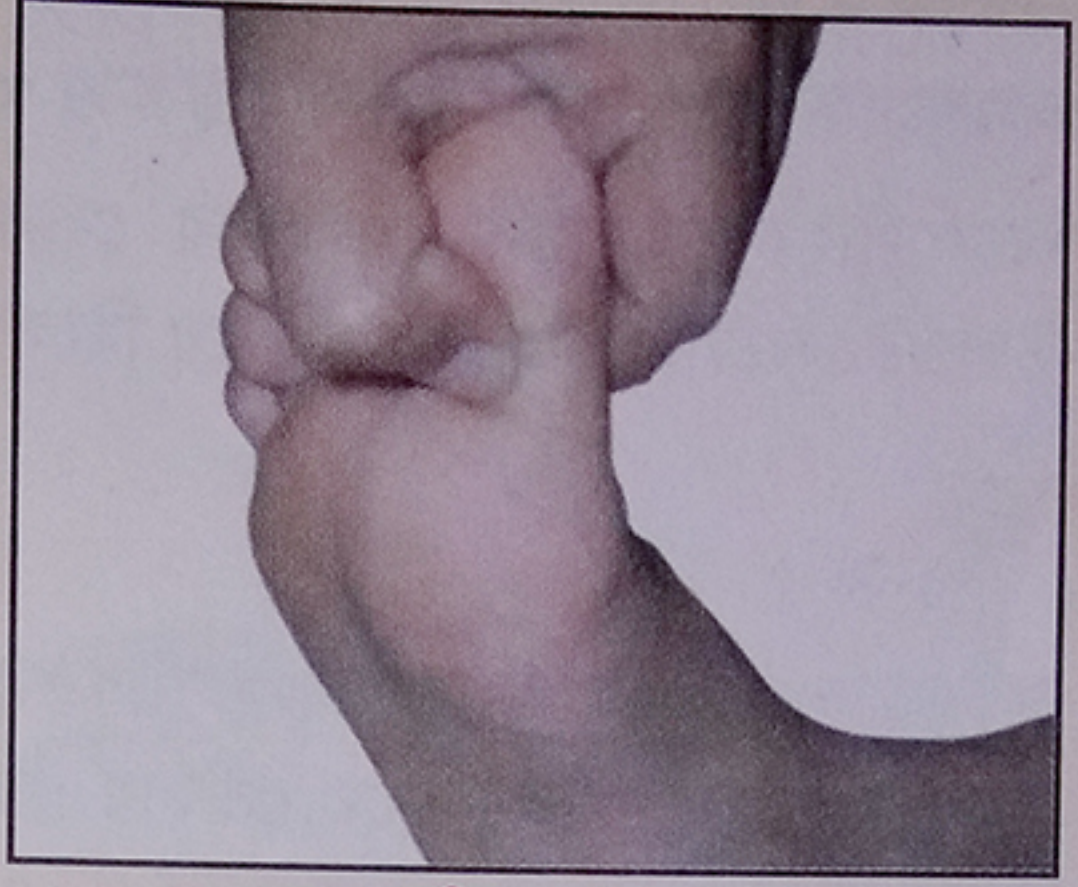
(চিত্র - ৪৯)

মস্তিস্কের সাথে দেহের সংযোগ স্থাপন করে যে শিরা-উপশিরাগুলো সেগুলোই মাথার শিরা। মাইগ্রেন বা মাথা ব্যথা হলে শিরাগুলো ফুলে যায়। অনেক সময় ব্যথায় টনটন করে।

বিন্দু নং-০৬ : গলা (Throat)
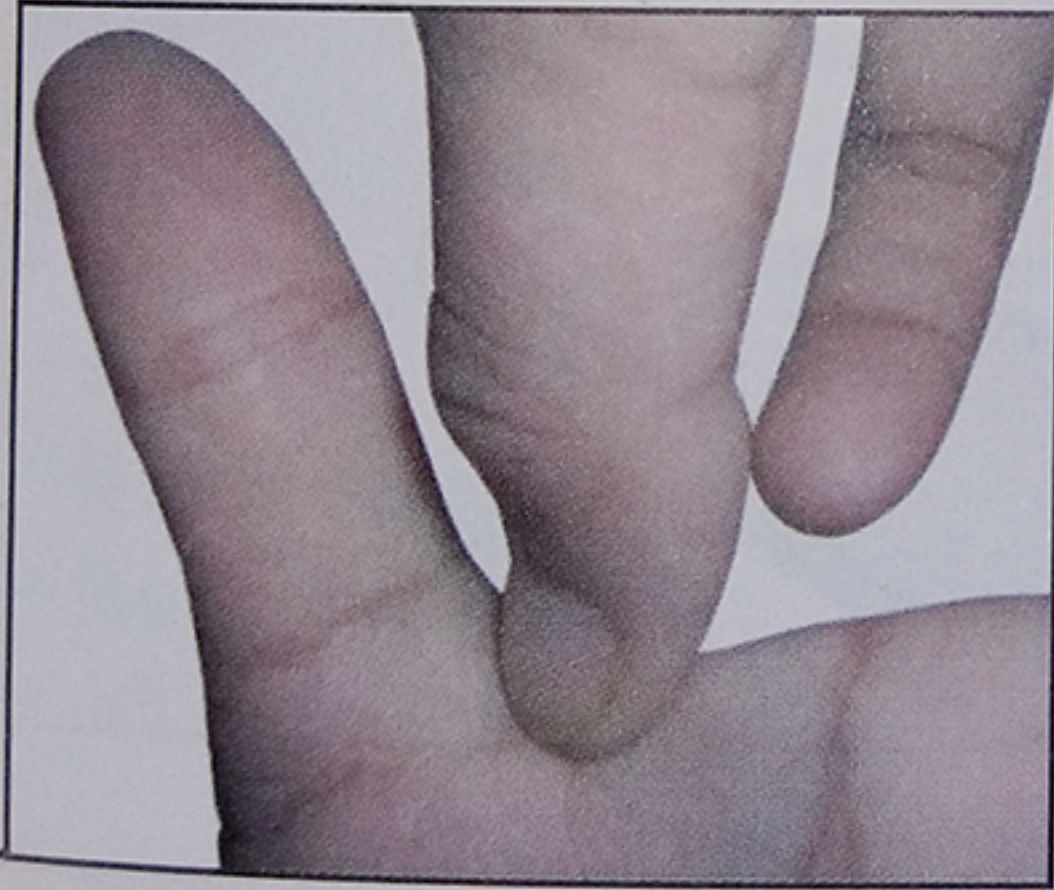
(চিত্র - ৫০)
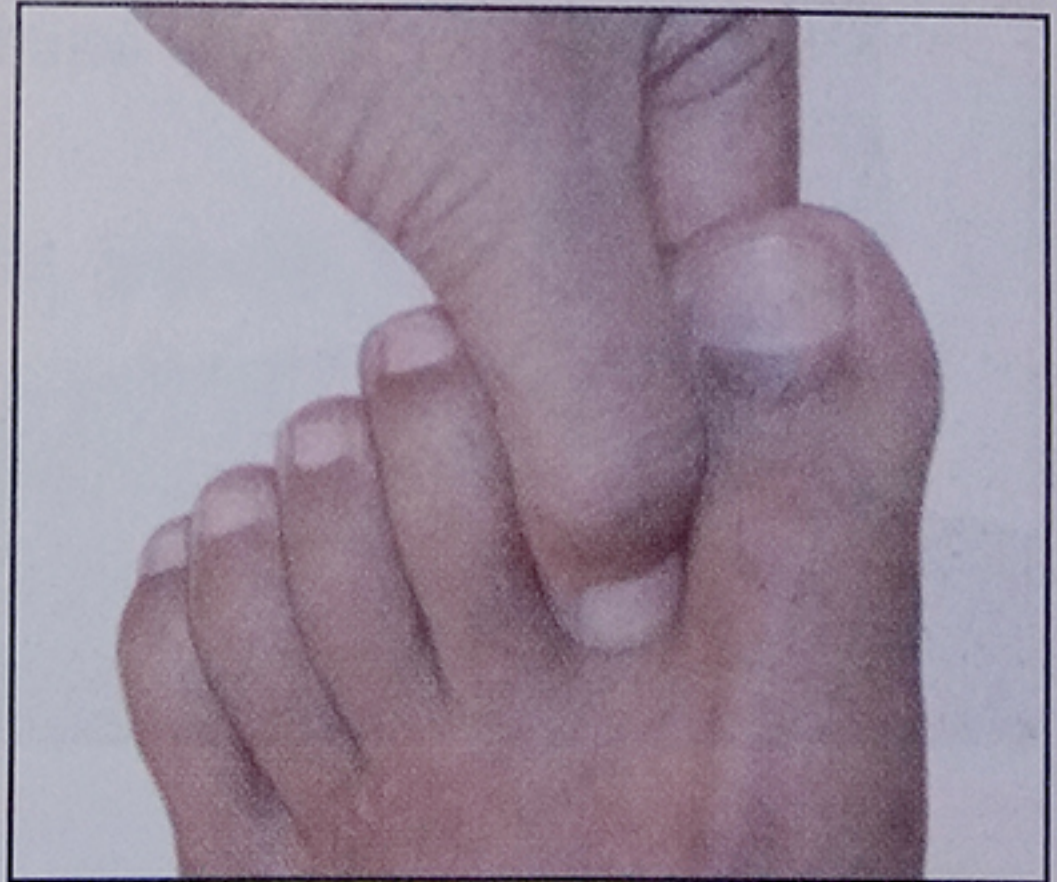
(চিত্র - ৫১)

গলার তিনটি অংশ রয়েছে যথা-

* স্বরযন্ত্র
* গলগহ্বর
* অন্ননালী

অবস্থান ঃ

স্বরযন্ত্র ঃ এটি শ্বাসনালীর উর্দ্ধে ও জিহ্বার মূলে অবস্থিত ।

গলগহ্বর ঃ এটি গলদেশে অবস্থিত ও খাদ্যবাহী অন্ননালীর উর্ধ্ব অংশ ।

অন্ননালী ঃ এই নালী গলগহ্বর থেকে সোজা শ্বাসনালীর পেছন দিয়ে নেমে উদরের ভিতরে পাকস্থলীতে গিয়ে মিলেছে ।

কাজ ঃ

স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ কথা বলতে পারে, গলগহ্বর ও অন্ননালীর মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের পর তা পাকস্থলীতে পৌঁছায় । ফলে খাবার পরিপাক হতে পারে ।

সমস্যা ঃ

গলা ব্যথা, টনসিল প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, গিলতে ব্যথা অনুভব করা ইত্যাদি ।

বিন্দু নং-০৭ : ঘাড় (ঘবপশ)

(চিত্র - ৫২)

(চিত্র - ৫৩)

মাথা ও দেহের সংযোগস্থল হচ্ছে ঘাড় ।

সমস্যা ঃ

* ঘাড়ের ব্যথা
* শিরা টান লাগা
* ঘাড় নাড়াতে না পারা ইত্যাদি ।

বিন্দু নং-০৮ :
থাইরয়েড/প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid/Parathyroid gland)
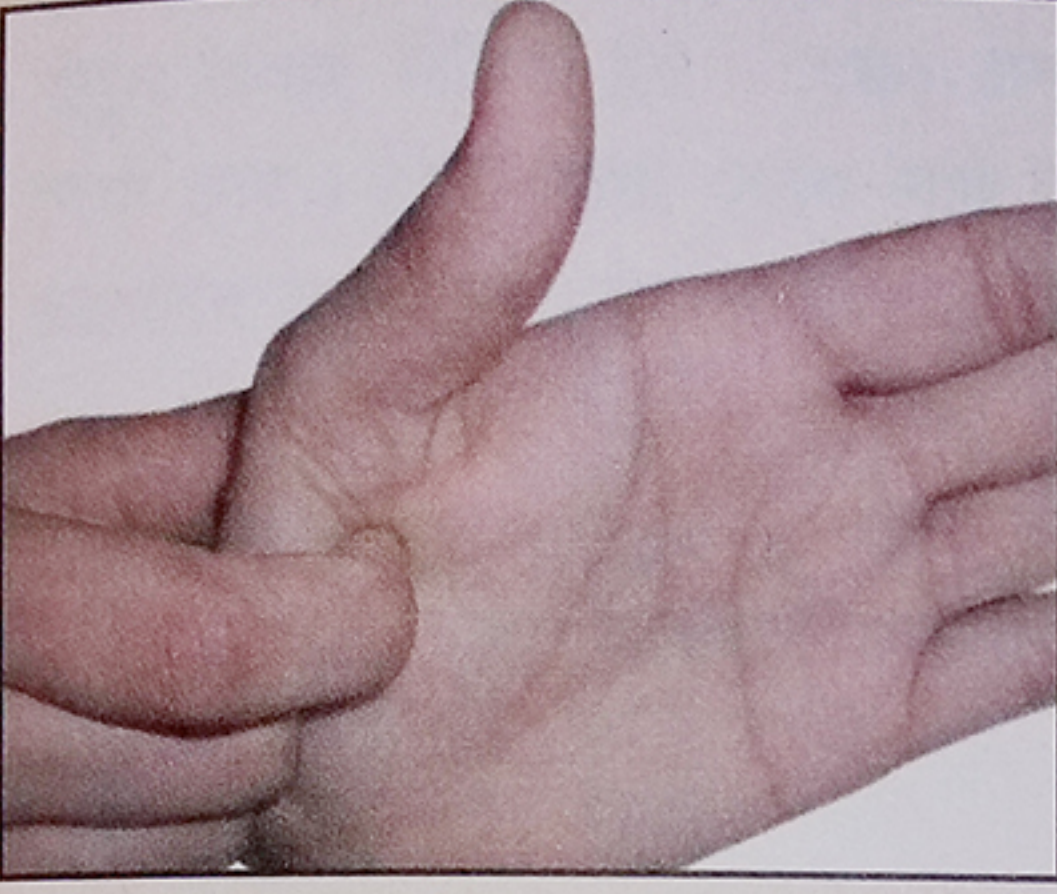
(চিত্র - ৫৪)

(চিত্র - ৫৫)

মানুষের গলার সামনে শ্বাসনালীর ওপর প্রজাপতির মত পাখা মেলে থাকে। এই গ্রন্থি থেকে এক ধরণের হরমোন বের হয় যার নাম থাইরক্সিন। এর কাজ খুব ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী।

কাজ ঃ
* এই গ্রন্থি শিশুর বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
* ক্যালসিয়াম পাচন করিয়ে দেহ থেকে বিষাক্ত বস্তু নির্মূল করে।
* দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ।
* এটি মানবিক গুণ যেমন -স্নেহ, ভালবাসা, চিন্তাশক্তি, মনঃসংযোগ নির্মাণে সাহায্য করে যার ফলে সংযম, শান্ত স্বভাব, নির্মল হৃদয় ও নিঃস্বার্থ চিত্ত বিকশিত হয়।
* কিডনীর কাজ বৃদ্ধি করে।
* এটি দেহের পেশীয় কাজ বৃদ্ধি করে।

সমস্যা ঃ
থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ঠিক মত না হলে-
* হাড়গুলি মোটা হয়, তবে লম্বা হয় না; দেহ মোটা ও খাটো হয়।
* চর্ম খসখসে ও মোটা ধরণের হয়।
* পেশীর ক্ষমতা কমে যায়।
* দেহ ফ্যাকাসে হয়।

* পেট মোটা হয় ও ঘাড়ে মেদ জমতে থাকে ।
* যৌন শিথিলতা দেখা দেয় ।
* দেহে ক্যালসিয়াম কমে যায় । তার ফলে পেশীতে মৃদু কম্পন দেখা দেয় ।
* হাড়ের দুর্বলতা দেখা দেয় ।
* ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় ও ঘন ঘন খেতে ইচ্ছে করে ।
* প্রস্রাব ঘন ঘন হয় ও মাত্রা বেড়ে যায় ।
* হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায় ।
* ছটফটানি ও হঠাৎ রেগে যাবার প্রবণতা দেখা দেয় ।
* বয়ঃসন্ধির পরে এই গ্রন্থি ঠিকমত কাজ না করলে কিডনীতে পাথর জমে ।

বিন্দু নং-০৯ : মেরুদন্ড (Spinal column)
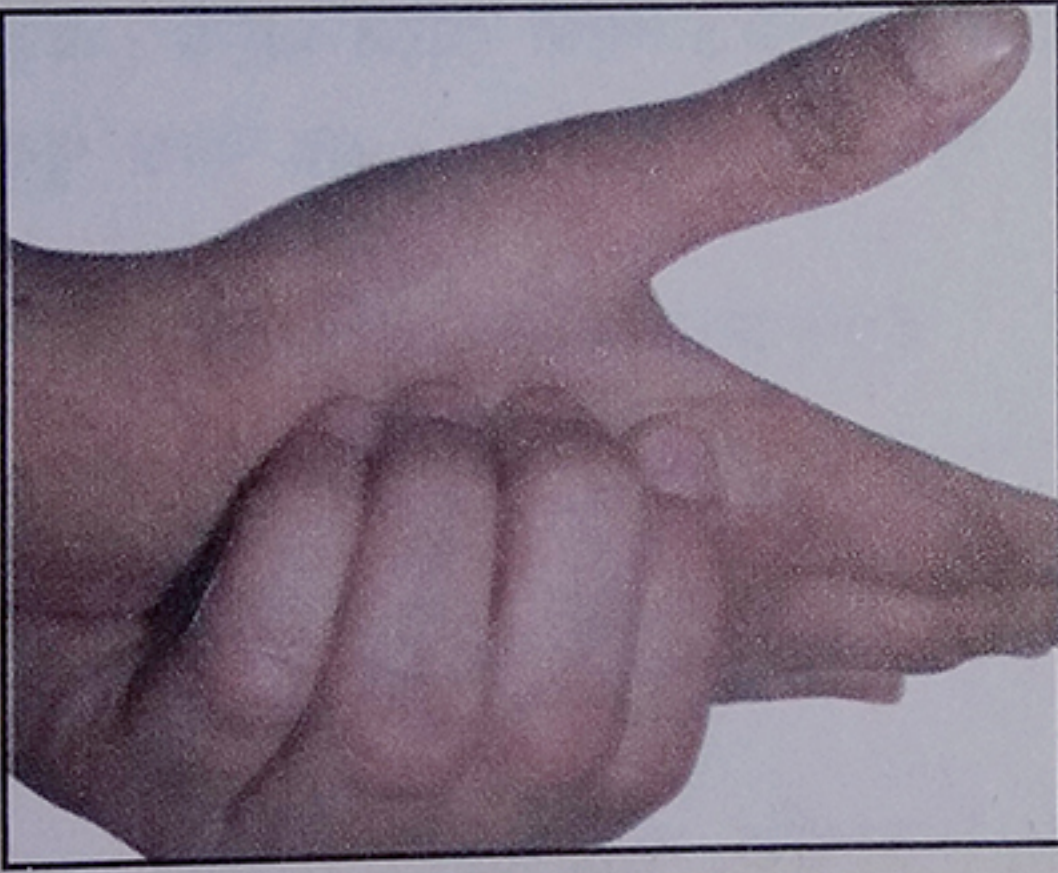
(চিত্র - ৫৬)

(চিত্র - ৫৭)

মেরুদন্ড বা শিরদাঁড়াকে বলা যেতে পারে শরীরের স্তম্ভ বা পিলার । এর সাহায্যেই মানুষের দেহ দাঁড়িয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা ঘাড় ও পিঠ সোজা ধরে রাখতে পারি ।

মেরুদন্ড বা শিরদাঁড়া ঘাড়ের নিচ থেকে পিঠ হয়ে কোমরের নিচ পর্যন্ত চলে গিয়েছে । ৩৪টি কশেরুকার সমন্বয়ে মেরুদন্ড গঠিত । মানবদেহের মেরুদন্ডের গঠন অনেকটা ইংরেজী ঝ অক্ষরের মত । মেরুদন্ডের নড়াচড়া, ভার বহন করার ক্ষমতা এবং কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে না পড়ার পেছনে মেরুদন্ডের এই গঠন শৈলী কাজ করে ।

মানব দেহে এই শিড়দাঁড়া প্রায় স্প্রিং-এর মত কাজ করে । প্রতিটি বাঁক মানুষকে আলাদা আলাদা সুবিধা প্রদান করে । মেরুদন্ড থেকে নির্গত স্বল্প দৈর্ঘ্যের স্নায়ুগুলো

মানবদেহের অভ্যন্তরে সামনে ও পেছনের দিকের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

যদি মেরুদন্ডে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তাহলে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। যেমন-বাকশক্তিকে ক্ষুন্ন করে, যার ফলে তোতলামি দেখা দেয়। ঠান্ডা লাগা থেকে যদি মেরুদন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে হৃৎযন্ত্রের চারপাশে যন্ত্রণা হয়। ভুল করে একে হৃৎযন্ত্রের অসুস্থতা মনে করা হয়।

লক্ষণ / সমস্যা ঃ

* কোমর ব্যথা।
* পিঠ ও মেরুদন্ডে ব্যথা।
* সায়াটিকা।

বিন্দু নং-১০ : অর্শ (Piles)

(চিত্র - ৫৮)
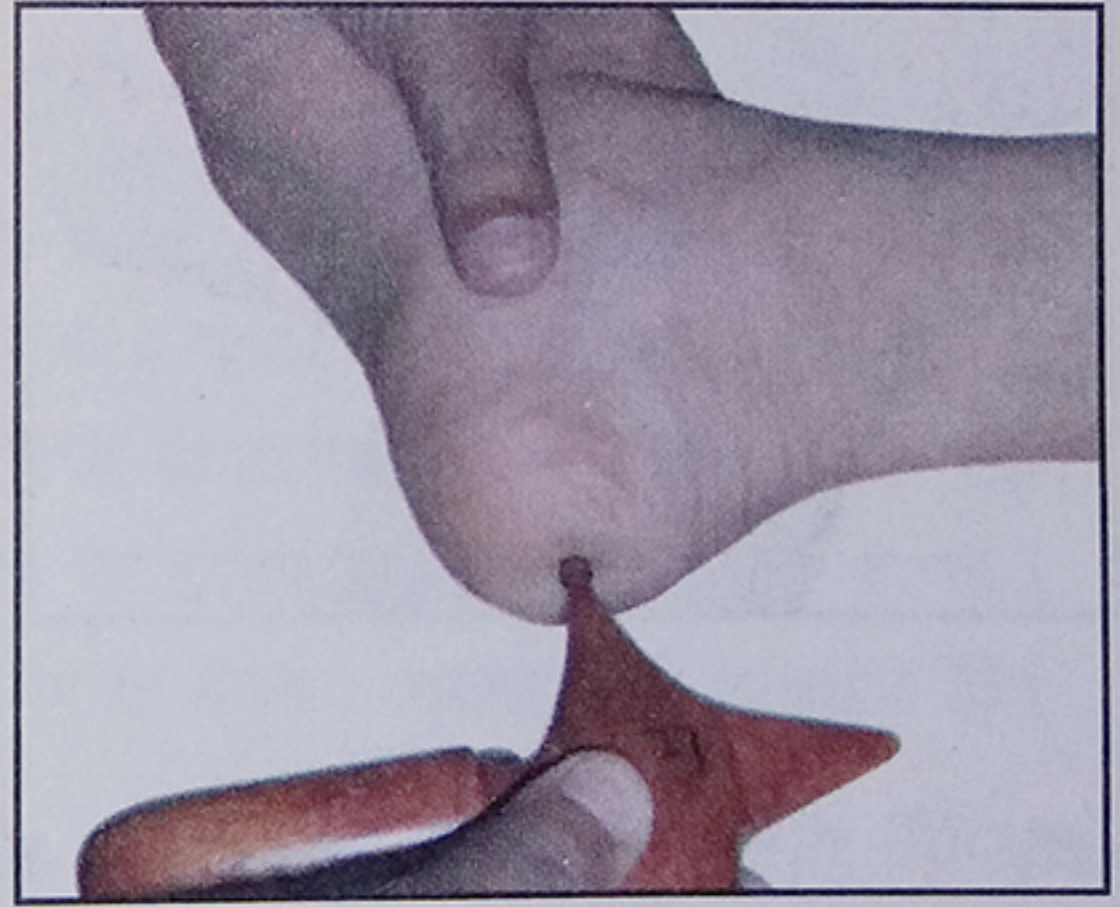
(চিত্র - ৫৯)

মলদ্বারের শিরা ফুলে ওঠা, পায়খানার সময় বা পরে এ থেকে রক্তপাতের নাম পাইলস বা অর্শ। এ ছাড়া পায়ু বা পায়খানার পথে ঘা, মাংসপিন্ড বের হয়ে আসা, ব্যথা অনুভব করা ইত্যাদিও অর্শের লক্ষণ।

যকৃতের দোষ, অনবরত কোষ্ঠকাঠিন্য, মাদকদ্রব্য সেবন, অধিক তেল, ঝাল, মশলা ও গরম মশলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি কারণে পাইলস হয়ে থাকে।

লক্ষণ / সমস্যা ঃ

* মলত্যাগকালে তাজা রক্তপাত হয়।
* মলদ্বারে ব্যথা ও যন্ত্রণা থাকে ।
* মলাশয় মলদ্বার দিয়ে ঝুলে পড়ে।
* মলদ্বারে কুট কুট করে।
* মলদ্বারে ফোঁড়া বা নালী ঘা হতে পারে।
* রোগীর রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
* হার্টের দুর্বলতা দেখা দেয়।
* মাথা ধরা ও মাথার যন্ত্রণা হয়।

বিন্দু নং-১১ : প্রোস্টেট গ্রন্থি (Prostate Gland)
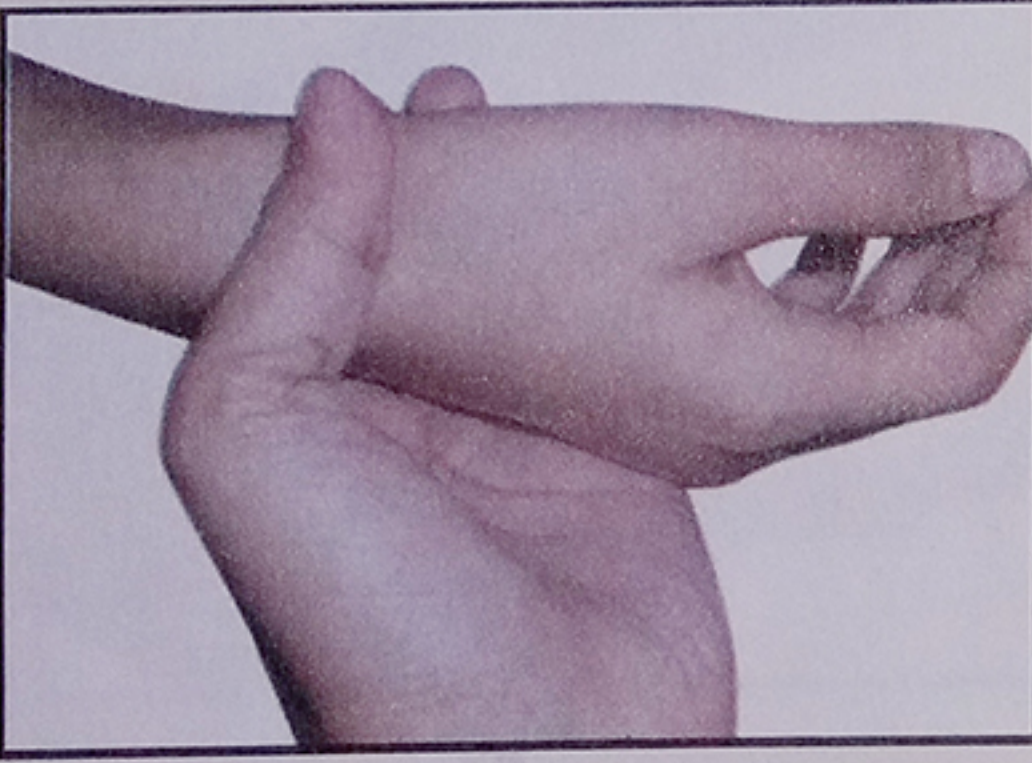
(চিত্র - ৬০)

(চিত্র - ৬১)

প্রোস্টেট গ্রন্থি মাংসপেশী, ফাইবার ও গ্রন্থিকলার সমন্বয়ে গঠিত। দু'টি শুক্রবাহী নালী ও শুক্রথলীর মুখ মিলিত হয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করে, এর ওজন ৯ গ্রাম।

প্রোস্টেট গ্রন্থির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এক ধরনের স্বচ্ছ চটচটে লালার মতো রস ক্ষরণ করা। এই স্বচ্ছ আঠালো তরল পদার্থ হচ্ছে প্রোস্টেট গ্রন্থির রস। উত্তেজনা কালে এই রস নিঃসৃত হয়ে মূত্রনালী দিয়ে গিয়ে ঐ নালীকে মসৃণ ও পিচ্ছিল করে বীর্য প্রবাহকে সাহায্য করে।

কম বয়সে এই গ্রন্থিটি আকারে ছোট ও নিষ্ক্রিয় থাকে। পরে শরীরে যৌবন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যৌন হরমোনের প্রভাবে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। তখন থেকে তা সক্রিয় হয়ে ওঠে পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে (৫০-৫৫ বছরের পরে)

শুকিয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো গ্রন্থিটি বড় হয়ে যাবার ফলে মূত্রনালীর অংশটুকু চাপ পেয়ে সংকুচিত হয়ে মূত্র নির্গমনের অসুবিধা সৃষ্টি করে। তা ছাড়া জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে প্রদাহ হলে মূত্র অবরোধে ভুগতে হয়।

বিন্দু নং-১২ : পুং/স্ত্রী জননেন্দ্রিয় (Penis & Vagina)
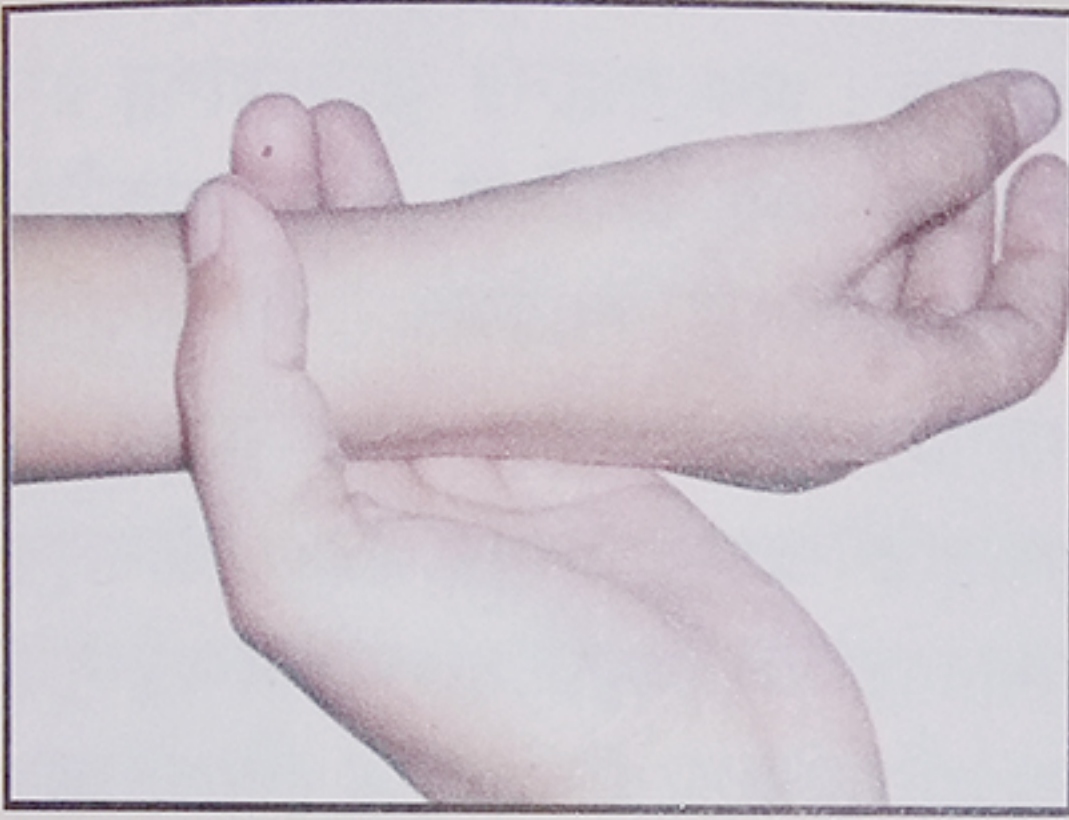
(চিত্র - ৬২)

(চিত্র - ৬৩)

পুং জননেন্দ্রিয় (Penis) : পুরুষাঙ্গ বা পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয়টি বস্তির বাইরে অর্থাৎ অন্ডকোষের সামনে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এটি ছোট ও নরম থাকে। উত্তেজিত হলে পেশীর মধ্যে রক্ত জমা হয়, ফলে এটি দৃঢ় ও বড় হয়। পুরষাঙ্গটি পুরো সম্প্রসারণশীল ঢাকনা বা চামড়ার আবরণে ঢাকা থাকে। এই অঙ্গটি একেবারেই অস্থিশূণ্য, স্পঞ্জের মতো নরম। পুরুষাঙ্গের মাধ্যমে বীর্য জরায়ু পর্যন্ত পরিবাহিত হতে পারে।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* হস্তমৈথূন
* স্বপ্নদোষ
* যৌন অক্ষমতা
* যৌন শীতলতা
* উত্থান সমস্যা।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় (Vagina) : এটি অনেকটা চোঙের মত ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা রক্তগামী সুড়ঙ্গ বিশেষ। বাইরের দিকে সংকীর্ণ অবস্থায় থাকলেও ভেতরের দিকে ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়েছে। খুব নরম প্রসারণশীল টিস্যু বা কোষ দিয়ে যোনিপথ গঠিত। সেকারণেই সন্তান প্রসবের সময় যোনিপথ অনেকখানি প্রসারিত হতে পারে । জরায়ুর সঙ্গে দেহের বাইরের অংশের যোগাযোগ রক্ষা করে যোনিপথ।

পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয় বা পুরুষাঙ্গ থেকে নিক্ষিপ্ত বীর্য এবং বীর্যস্থ শুক্রকীটগুলো যোনিপথ ধরেই জরায়ুতে প্রবেশ করে। আবার গর্ভে সন্তানের জন্ম হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পরে এই যোনিপথ দিয়েই সন্তান ভূমিষ্ট হয়। যোনিপথে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালী ও শিরা-উপশিরা এসে মিলিত হয়েছে। এক ধরনের অম্লভাবাপন্ন রস দ্বারা যোনিপথ প্রায় সব সময়ই সিক্ত থাকে। এই রসটিকে বলে ল্যাকটিক এসিড। এসিড থাকার ফলে যোনিপথ খুব ছোটখাট সংক্রমণ বা জীবানুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

এই এসিড না থাকা বা এসিডের অনুপস্থিতি অনেক সময় রোগ জীবাণুর আক্রমণের পথকে প্রশস্ত করতে পারে। সাধারণত এই অম্লরসের অভাব হয় দুটি ক্ষেত্রে। এক, মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগে ও পরে বন্ধ হয়ে গেলে; আর দুই, ঋতুস্রাব চলাকালীন ও প্রসব হওয়ার পরের কিছুদিন।

অম্লরস তৈরি হয় যোনিপথে অবস্থিত নিরীহ জীবাণুর সঙ্গে যোনি গাত্রের গ্লুকোজের ক্রিয়ার ফলে। তাই এই অম্লরসের অভাব তখনই হয় যখন ঋতুস্রাবের ঘাটতি অথবা কাজ বন্ধ হয়।

এ সময়ে সতর্ক থাকা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা খুব দরকার এমন কি ঋতুস্রাবের সময় যৌন মিলনও এড়িয়ে চলা দরকার কারণ এতে সহজেই জননেন্দ্রিয় জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে।

সমস্যা ঃ

* যোনি প্রদাহ
* যৌন মিলনে ব্যথা বা জ্বালা অনুভব
* শ্বেত প্রদর।

বিন্দু নং-১৩ : জরায়ু (Uterus)
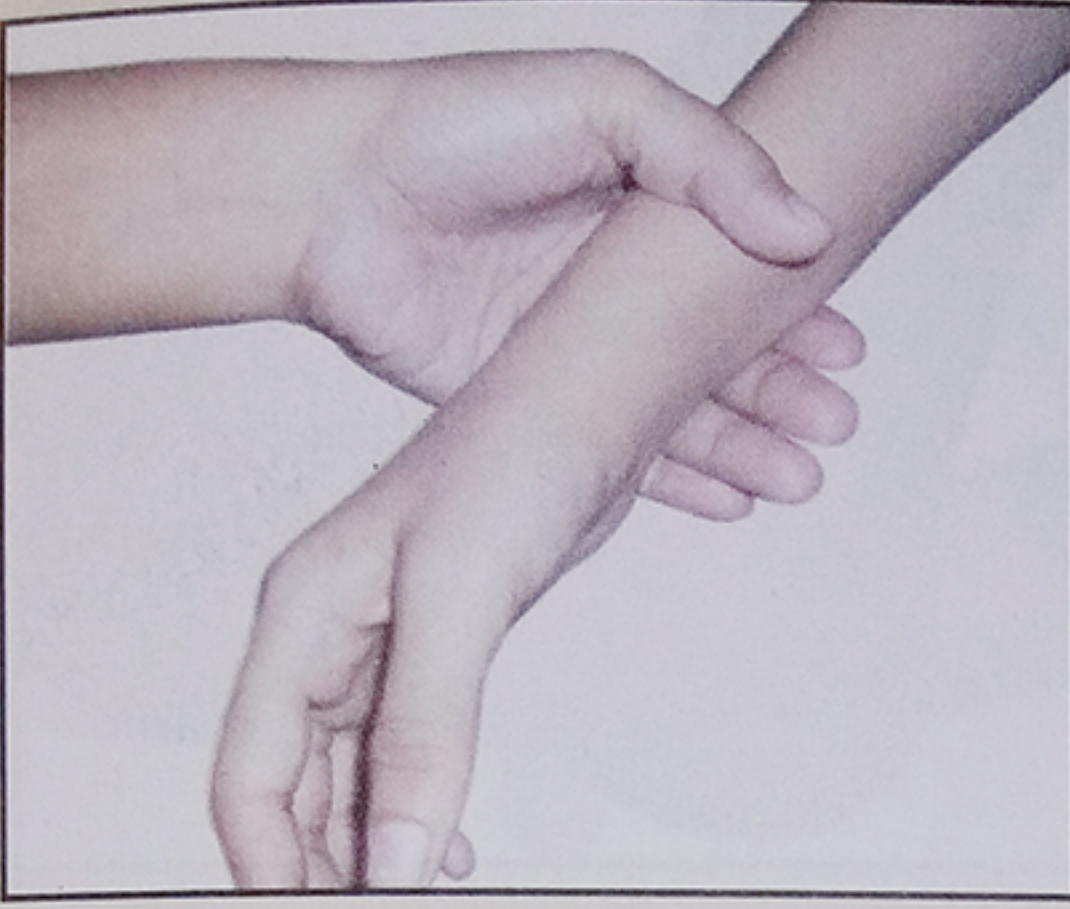
(চিত্র - ৬৪)
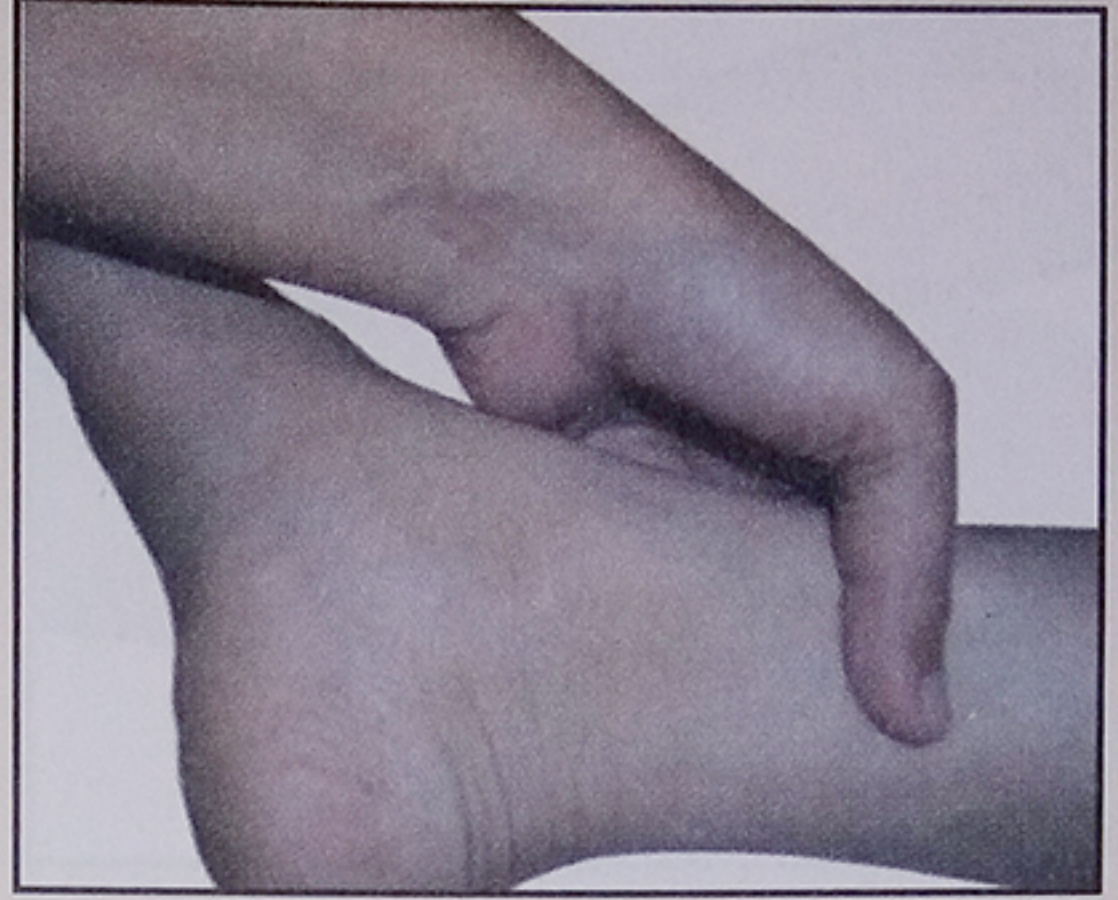
(চিত্র - ৬৫)

জরায়ু থাকে বস্তিকোটরে মূত্রাশয়ের ঠিক পেছনে। জরায়ুর পেছনেই থাকে মলাশয়। এর আকার অনেকটা ওল্টানো কলসির মতো অথবা নাশপাতির মতো একটু চ্যাপ্টা ধরনের এই জরায়ুর আকার স্বাভাবিক অবস্থায় ৩-৪ ইঞ্চির মতো। মাংসপেশী সমৃদ্ধ এই জরায়ু স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জরায়ুর ভেতরটা ত্রিকোণাকৃতি। জরায়ু উত্থানশীল পেশী দিয়ে তৈরি তাই প্রয়োজনে প্রসারিত হতে পারে যেমন হয় গর্ভে সন্তান এলে ।

কাজ ঃ

জরায়ুর প্রধান কাজ হলো উৎপাদনক্ষম শুক্রকীটকে আশ্রয় করে ভ্রুণকে ধারণ করা ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে গর্ভে পোষণ করে সযত্নে বৃদ্ধি করা।

সমস্যা - লক্ষণ ঃ

* অনিয়মিত মাসিক।
* অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা কম রক্তস্রাব।
* সাদা স্রাব।
* জরায়ুর স্থানচ্যুতি।
* মাসিকের সময় পেটে ব্যথা।
* জরায়ুর মুখে প্রদাহ।
* জরায়ু টিউমার।
*জরায়ু ক্যান্সার।

বিন্দু নং-১৪ : ডিম্বাশয় (Ovaries)

(চিত্র - ৬৬)

(চিত্র - ৬৭)

জরায়ুর দু'পাশে দু'টি ডিম্বকোষ বা ডিম্বাশয় থাকে। এ দু'টির আকৃতি অনেকটা ডিমের মত। দৈর্ঘ্য প্রায় ১ ইঞ্চি। এদের মধ্যে উৎপন্ন হয় স্ত্রী ডিম্ব। মেয়েদের যৌনগ্রন্থি হচ্ছে এই দু'টি ডিম্বকোষ।

মেয়েদের ডিম্বকোষ দু'ধরনের রস বা হরমোন ক্ষরণ করে। ইস্ট্রোজেন রস স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর যৌবনের ধর্মগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয় ধরনের রস যাকে বলে প্রজেস্টেরন, সন্তানের বোধ, বুদ্ধি, স্থিতি ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* ডিম্বাশয়ের প্রদাহ।
* টিউমার।
* ক্যান্সার।
* সন্তানহীনতা।

বিন্দু নং-১৫ : অন্ডকোষ (Testes)

(চিত্র - ৬৮)

(চিত্র - ৬৯)

পুরুষাঙ্গ বা যৌন ইন্দ্রিয়ের নিচেই একটি থলির মধ্যে দু'টি শক্ত বীচির মতো থাকে, তাকে অন্ডকোষ বলে। আর এ অন্ডকোষ দু'টি যে থলির মধ্যে থাকে তাকে অন্ডথলি বলে।

প্রতিটি অন্ডকোষের মধ্যেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ড থাকে। এসব খন্ডের মধ্যে পাকানো সুতার মতো নালী আছে। এই নালীগুলোর মধ্যে শুক্রকীট থাকে। প্রধানত এই অন্ডকোষ দু'টির কাজ হচ্ছে শুক্রকীট তৈরি করা এবং যৌন হরমোন ক্ষরণ করা।

সমস্যা – লক্ষণ ঃ

* ধাতু দুর্বলতা।
* ধাতু স্রাব।
* দ্রুত বীর্যস্খলণ।
* সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা।

বিন্দু নং-১৬ : লসিকা গ্রন্থি (Lymph Gland)
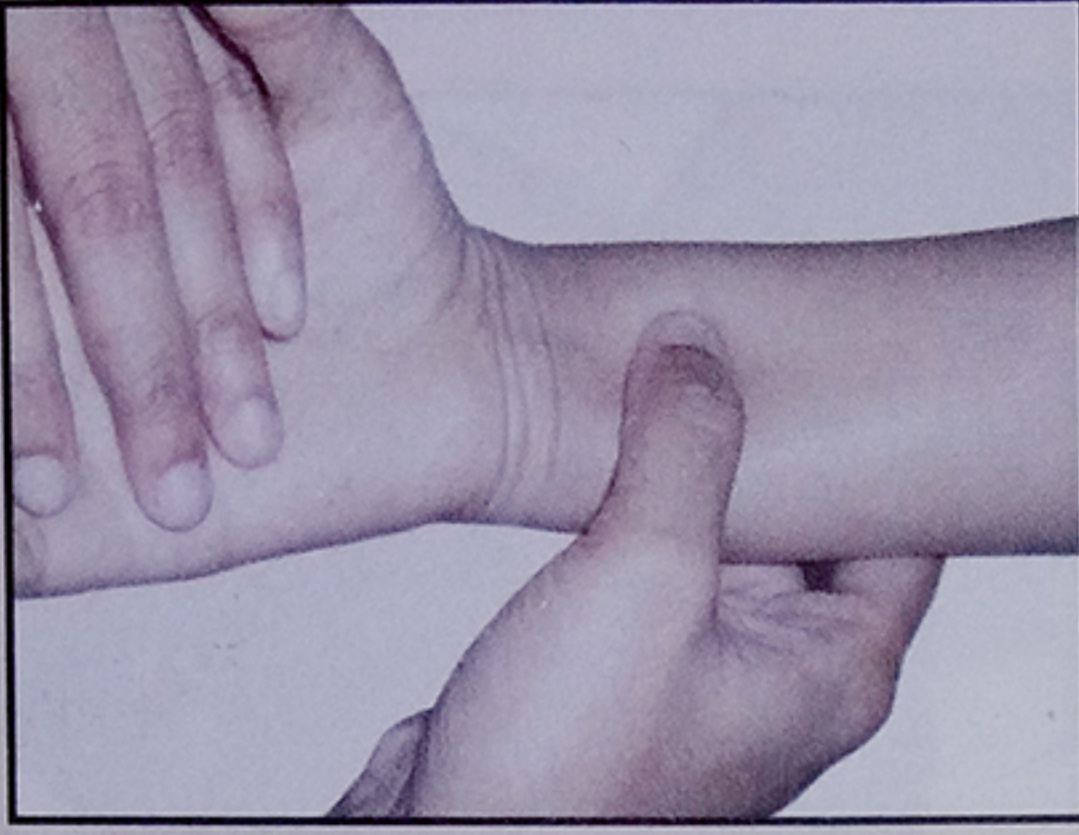
(চিত্র - ৭০)

(চিত্র - ৭১)

লসিকা দেখতে সাধারণত পানির মতো। লসিকা প্রন্থিগুলো দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিষাক্ত বস্তুকে রক্তে মিশতে এটি বাধার সৃষ্টি করে। ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস রোধ করতে এই গ্রন্থিকে সক্রিয় রাখা দরকার।

কাজ ঃ

* দেহের যে অঞ্চলে রক্ত পৌঁছতে পারে না, সেখানে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।
* কাটা, পোড়ার উপরে পূঁজ হওয়া রোধ করে, ক্ষতস্থান দ্রুত সারিয়ে তোলে।
* শরীর থেকে জৈব বিষ ও মৃত কোষ দূর করে।
* রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

বিন্দু নং-১৭ : নিতম্ব ও হাঁটু (Hip & Knee)
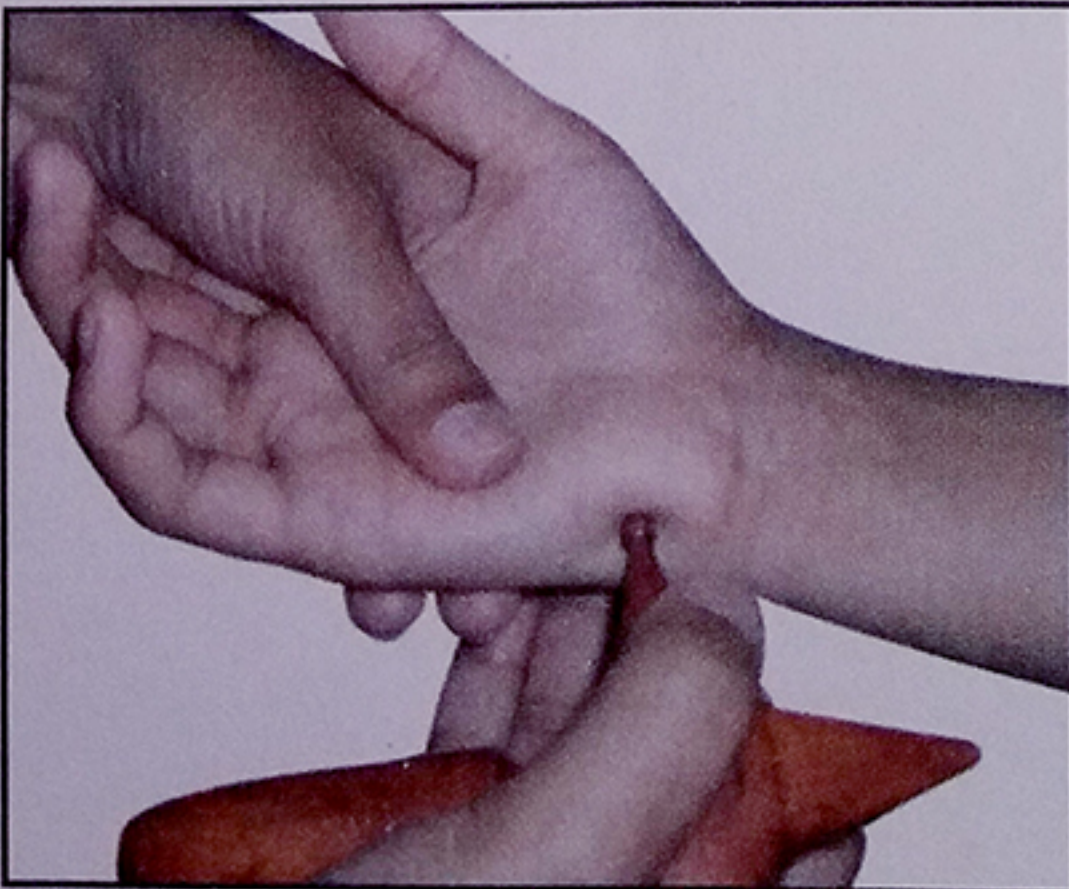
(চিত্র - ৭২)

(চিত্র - ৭৩)

পায়ের উপর প্রান্তের মাংসল ঢিবি যুগলকে নিতম্ব (Hip) বলে। নিতম্ব অস্থির (Hip bone) উপর গ্লুটিয়াস (Gluteus) মাংসপেশীর তিনটি আস্তরণ দিয়ে নিতম্ব গঠিত। উরুর অস্থির (Femur) সাথে নিতম্ব অস্থির সংযোগ সন্ধি (Hip joint) নিতম্বের নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত।

উরু অস্থি (Femur) ও পায়ের (Leg) বড় অস্থির (Tibia) সন্ধিকে হাঁটু (Knee) বলে। এটি দেহের ভারবাহী একটি বড় সন্ধি। বয়সকালে এই অস্থি দুটির প্রান্তভাগ ক্ষয় হয়ে হাঁটুর বাত (Osteo arthritis) সৃষ্টি করে।

বিন্দু নং-১৮ : মূত্রাশয় (Urinary Bladder)
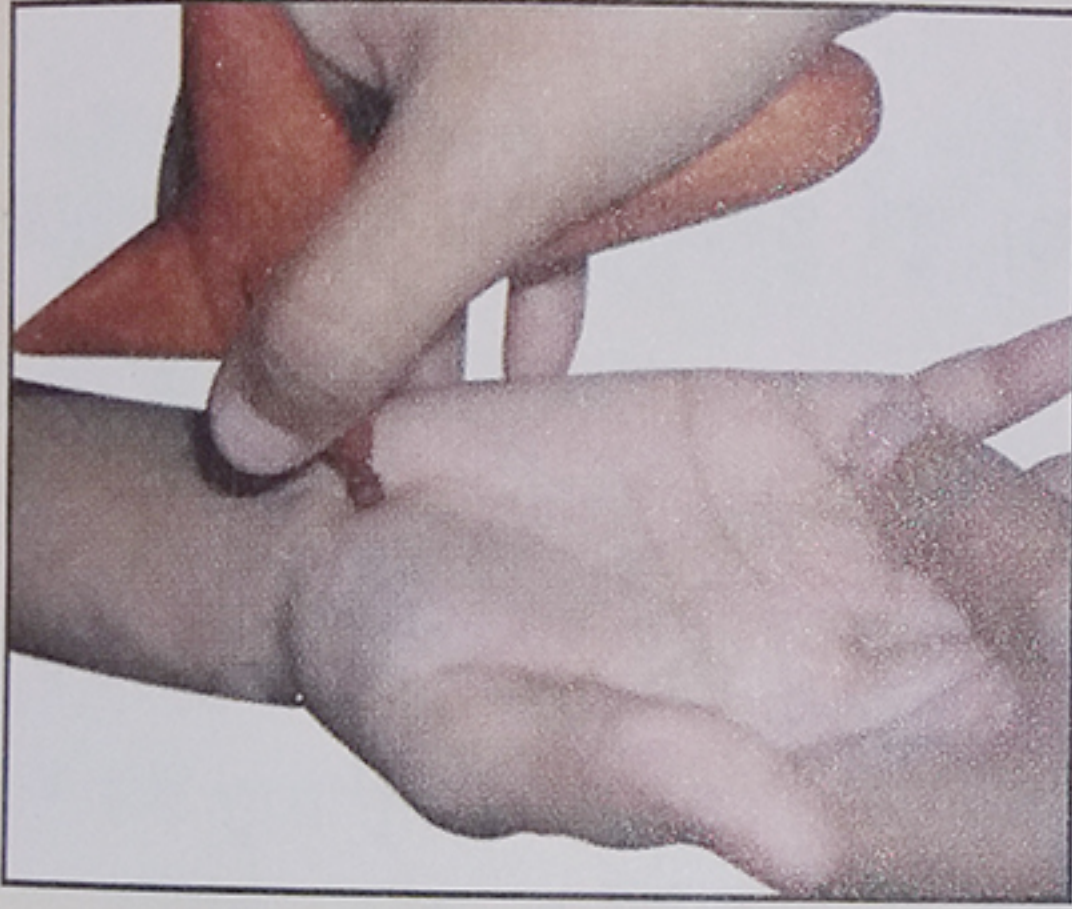
(চিত্র - ৭৪)
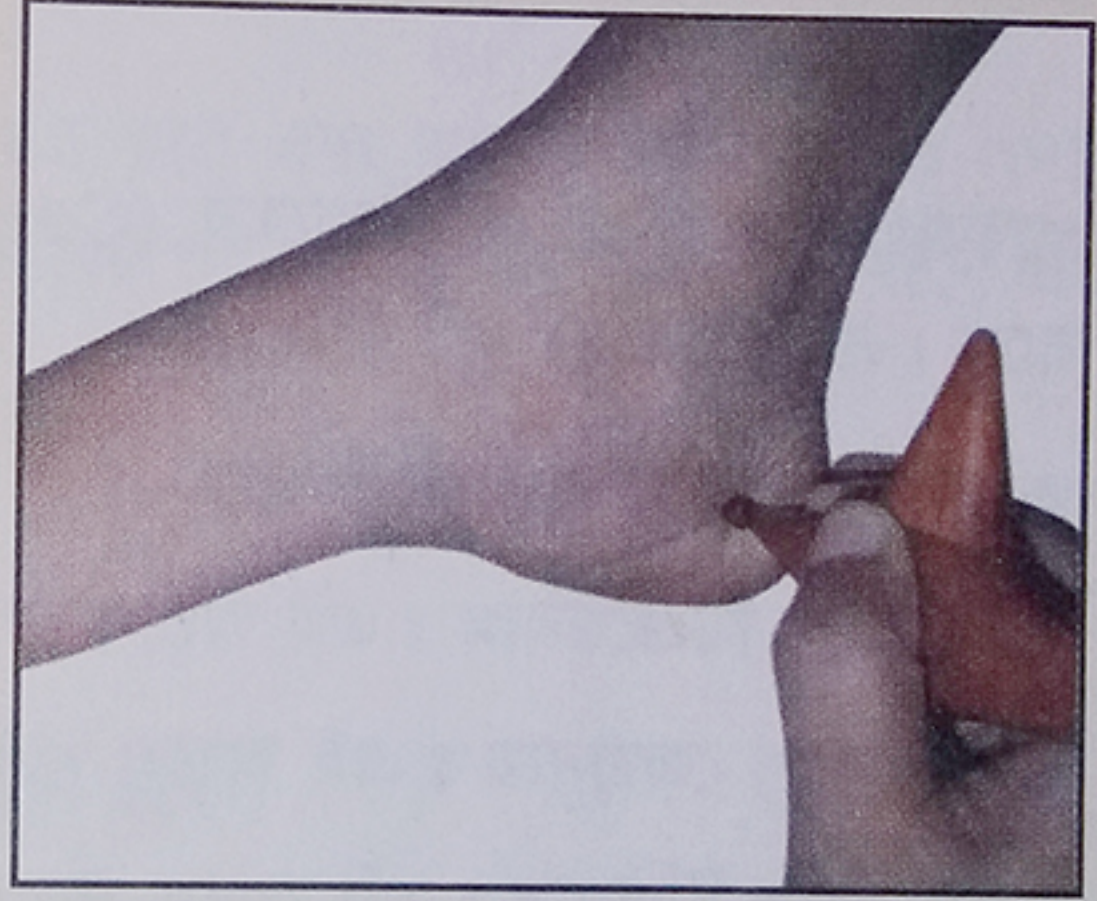
(চিত্র - ৭৫)

মানুষের শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ হয় প্রস্রাবের মাধ্যমে। কিডনী রক্ত থেকে দূষিত পদার্থ ছাঁকার পরে যে স্থানে প্রস্রাব জমা হয় তাই মুত্রাশয়/ মূত্রথলি।

মূত্রথলির কাজ মূত্র ধারণ করা এবং সময়মত মূত্রনালীর মাধ্যমে তা বের করে দেয়া।

সমস্যা ঃ

* অতিরিক্ত প্রস্রাব।
* অল্প বা কম প্রস্রাব।
* প্রস্রাবের পথে জ্বালা পোড়া।
* হলুদ রংয়ের প্রস্রাব হওয়া।
* প্রস্রাব আটকে আসা।
* প্রস্রাবের বেগ ধরে রাখতে না পারা।

বিন্দু নং-১৯ : ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine)

(চিত্র - ৭৬)

(চিত্র - ৭৭)

পাকস্থলীর পর থেকে সিকামের (Cecum) পূর্ব পর্যন্ত অন্ত্রের অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। এটি প্রায় ২১ ফুট লম্বা হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্র আবার তিন ভাগে বিভক্ত-

প্রথম অংশ ডিওডেনাম ঃ এই অংশে অম্লীয় খাদ্য ক্ষারীয় খাবারে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় অংশ জেজুনাম ঃ এই অংশে খাদ্য পরিপাক ও শোষন করে।

তৃতীয় অংশ ইলিয়াম ঃ এই অংশে খাদ্য মূলত শোষিত হয়।

কাজ ঃ

* ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক হয় এবং খাদ্যসার শোষিত হয়।
* পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয়ের রসের মাধ্যমে অম্লীয় খাবার ক্ষারীয় খাবারে রূপান্তরিত হয়।

সমস্যা ঃ

ক্ষুদ্রান্ত্র খাবার ঠিকমত হজম করতে না পারলে-

* বদহজম।
* পেটফাঁপা।
* আমাশয়।
* উদরাময়।
* পেটে ব্যথা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

বিন্দু নং-২০ : মলাধার (Colon)

(চিত্র - ৭৮)

(চিত্র - ৭৯)

শরীর খাবার থেকে ভিটামিন ও পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং অপ্রয়োজনীয় দূষিত পদার্থ মলের মাধ্যমে বের করে দেয় । খাবার হজমের পর অপ্রয়োজনীয় অংশ যেখানে জমা হয় তাকে মলাধার বলে ।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে ।
* মল পুরোপুরি পরিস্কার হয় না এমন মনে হবে ।
* পলিপাস হতে পারে ।
* ক্যান্সার হতে পারে ।

বিন্দু নং-২১ : এপেন্ডিক্স (Appendix)

(চিত্র - ৮০)
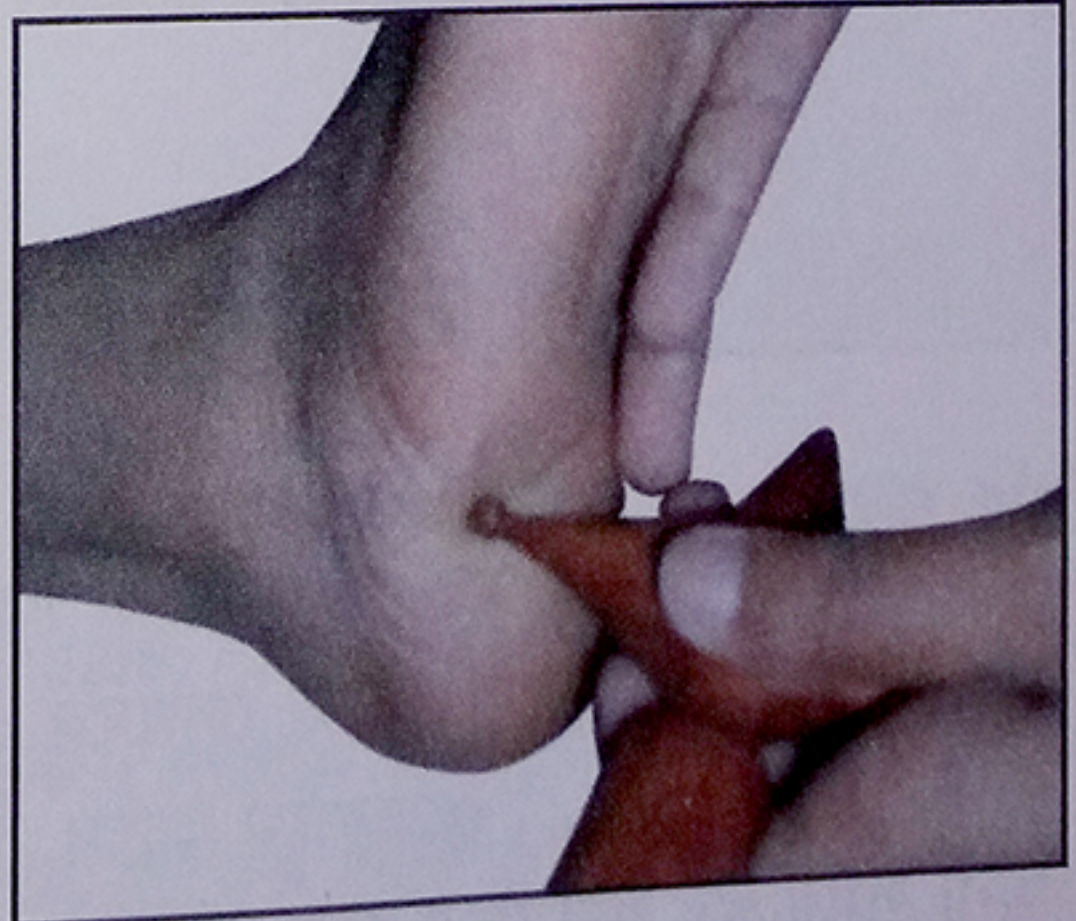
(চিত্র - ৮১)

বৃহদান্ত্রের প্রারম্ভে সিকামের উপরিভাগ থেকে কেঁচোর ন্যায় উদগত অংশকে উপাঙ্গ বা এপেনডিক্স বলে। এর একদিকে খোলা ও অন্যদিক বন্ধ থাকে। এর তেমন কোন কার্যকারিতা নেই শরীরে। উপাঙ্গ বা এপেন্ডিক্সের এক মাত্র রোগ হিসাবে এপেনডিসাইটিস দেখা দেয়। কৃমি বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য খোলা দিক দিয়ে ঢুকলে বের হতে পারে না। ঐ খাদ্যের প্রদাহ হলে তাকেই এপেনডিসাইটিস বলে।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* গা বমি বমি ভাব ও বমি।
* তলপেটের ডান পাশের নিম্নভাগে খুব বেশি ব্যথা অনুভব করা।
* যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হয়ে পড়ে।

বিন্দু নং-২২ : পিত্তথলি (Gall bladder)
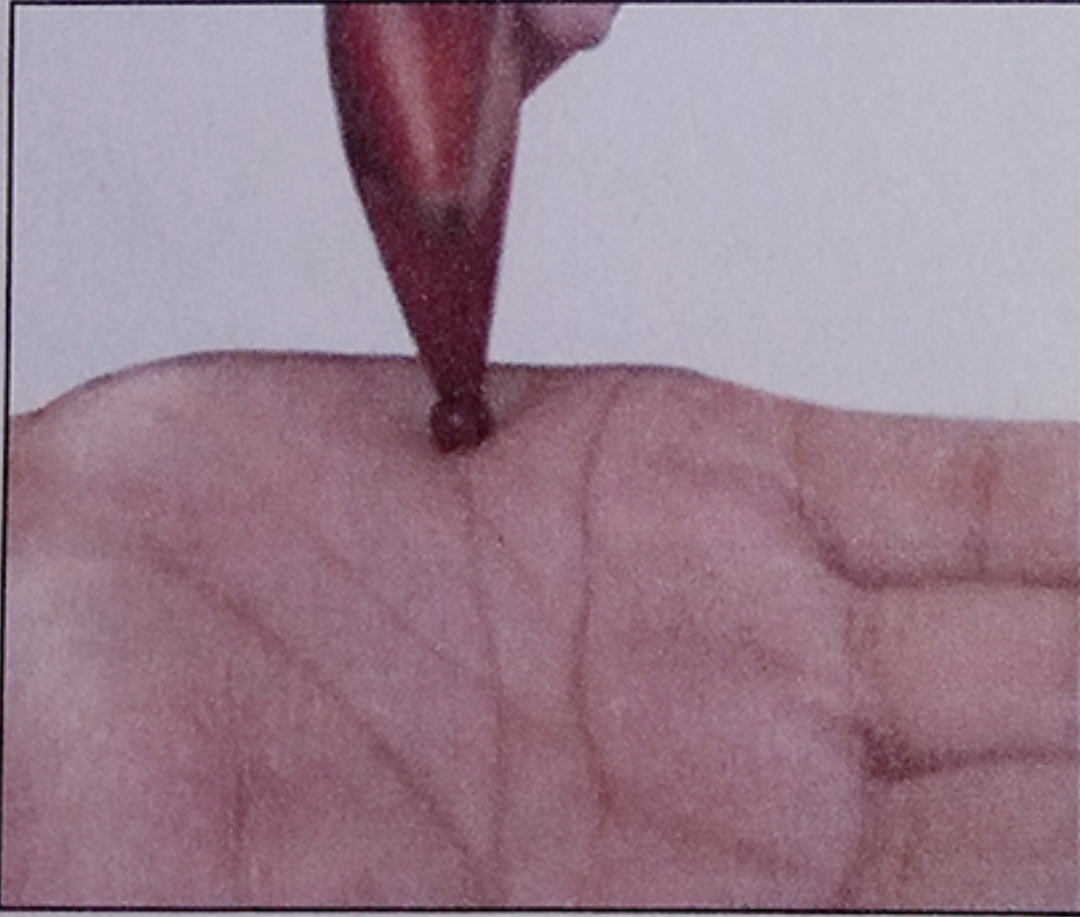
(চিত্র - ৮২)

(চিত্র - ৮৩)

পিত্তকোষ পেয়ারার মত আকৃতি যা লিভারের ঠিক নিচে থাকে। লিভারের মধ্যে একটি notch বা গর্ত থাকে সেখানে এর অবস্থান। এটি লম্বায় তিন থেকে চার ইঞ্চি। যখন খাদ্য ডিওডেনামে আসে, তখন এটি থেকে যথেষ্ট পিত্ত নিঃসৃত হয়। অন্য সময় খুব কম পিত্ত বের হয়।

কাজ ঃ

* পিত্তরস সঞ্চয় করা।
* পিত্তরসকে ঘন করে তোলা।
* স্নেহ জাতীয় খাদ্য হজমে এবং মলত্যাগে সাহায্য করা।
* অন্ত্রের নড়ায় বা movement -এ অনেকটা সাহায্য করা।
* প্যানক্রিয়াস/ অগ্নাশয়কে সক্রিয় রাখা।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* পেটের ডান দিকে কাঁধ ও পিঠ পর্যন্ত প্রচন্ড ব্যথা।
* গা বমি বমি ভাব দেখা দেয়া।
* শরীরে শীতল ঘাম হওয়া।
* পেটের চার ধারে ব্যথা ছড়িয়ে পড়া।
* নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া।
* মুর্চ্ছা যাওয়া।

বিন্দু নং-২৩ : যকৃত (Liver)
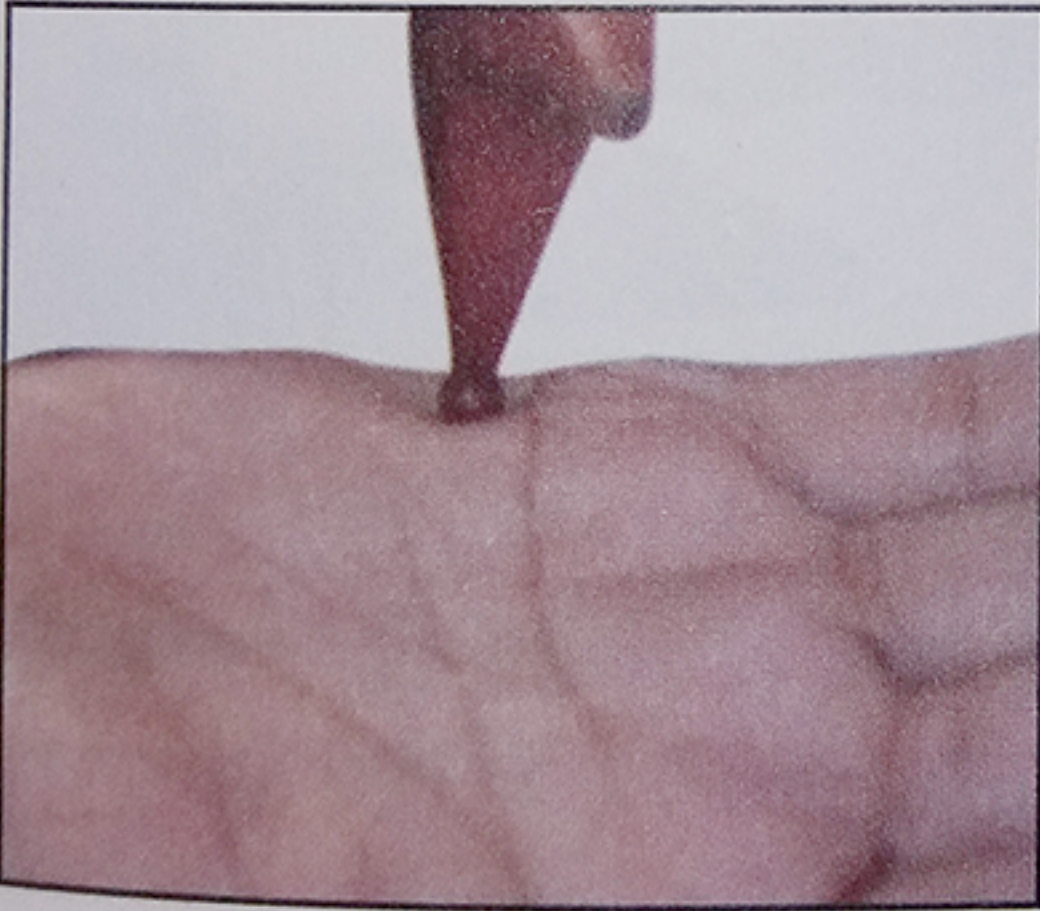
(চিত্র - ৮৪)

(চিত্র - ৮৫)

লিভার হলো শরীরের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। এটি লম্বায় প্রায় ১২ ইঞ্চি, চওড়া ৬ ইঞ্চি। এটি দেখতে পিঙ্গল রঙের। পেটের ডান দিকের উপরভাগে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদার ঠিক নিচে অবস্থিত। কালচে লাল বা চকোলেট রঙের দেখতে যকৃতটির বাম দিকের প্রান্তভাগ বাম দিকের পাকস্থলীর বা পাকাশয়ের ওপরের অংশে থাকে। যকৃত পিত্তরস তৈরি করে তা পিত্তথলিতে পাঠায়।

পিত্তথলি থেকে পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে নিঃসৃত হয়। ফলে অম্লীয় অর্ধতরল খাদ্য ক্ষারীয় পদার্থে পরিণত হয়।

কাজ ঃ

* শরীর যত ত্যাজ্য পদার্থ জমা করে তা বের করে দেয়।
* অন্ত্রে বিভিন্ন শোষিত পদার্থকে দেহের কাজে লাগায়।
* চর্বি, ভিটামিন, লৌহ প্রভৃতি শরীরের অতি প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থ সঞ্চয় করে এবং সময় মতো তাদের ঠিক ঠিক কাজে লাগায়।
* শরীরে তাপ সৃষ্টি ও দেহের তাপ রক্ষা করে।
* পিত্তরস নিঃসরণ করে যা হজম, মল গঠন ও মল ত্যাগে সাহায্য করে।
* শরীরকে বিভিন্ন জীবাণুর হাত থেকে রক্ষার কাজে সাহায্য করে লিভার।

লক্ষণ / সমস্যা ঃ

* এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়।
* শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়।
* পেটে বায়ু উৎপন্ন হয়ে পেট ও অন্ননালীতে জ্বালাভাব হয়।
* দাঁত ও মাড়ির শক্তি কমে যায়।
* মুখে ও অন্ত্রে আলসার হয়।
* চোখের কার্যক্ষমতা কমে যায়।
* বীর্যরস ও ডিম্বাণু পাতলা হয়।
* বমি বমি ভাব।
* চর্মরোগ, চুল ওঠা, রাগী ও খিটখিটে স্বভাবের হয়।
* জন্ডিস হবার সম্ভাবনা থাকে।
* প্রস্রাব হলুদ বর্ণের হতে পারে।
* পেটে বা পায়ে জল জমা।
* উপর পেটে ব্যথা, অস্বস্তি ও ঢেঁকুর ওঠা।
* শরীর দুর্বল লাগা।

পথ্য ঃ

* গ্লুকোজের জল, ডাবের পানি, কমলা লেবু ও মিষ্টি মুসম্বির রস, আখের রস, মাঠা তোলা দুধ খেতে দেওয়া উচিত।

* অল্প মসলার ঝোল তরকারি, আলু, পেঁপে, নরম ভাত দেওয়া উচিত।
* ছোট মাছ দেওয়া যেতে পারে।
* ১০০ গ্রাম জলে অর্ধেক লেবু চিপে লবণ দিয়ে (চিনি ছাড়া) পান করতে হবে। এতে ১৭-২১ দিনের মধ্যে যকৃতের বিকার সেরে যাবে।

পরামর্শ ঃ

রোগী যকৃত প্রদাহে আক্রান্ত হলে পর্যাপ্ত বিশ্রামে থাকতে হবে। ভারী বস্তু উঠানামা করা যাবে না। মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি রোদে বের হওয়া যাবে না।

বিন্দু নং-২৪ : কাঁধ (Shoulder)

(চিত্র - ৮৬)
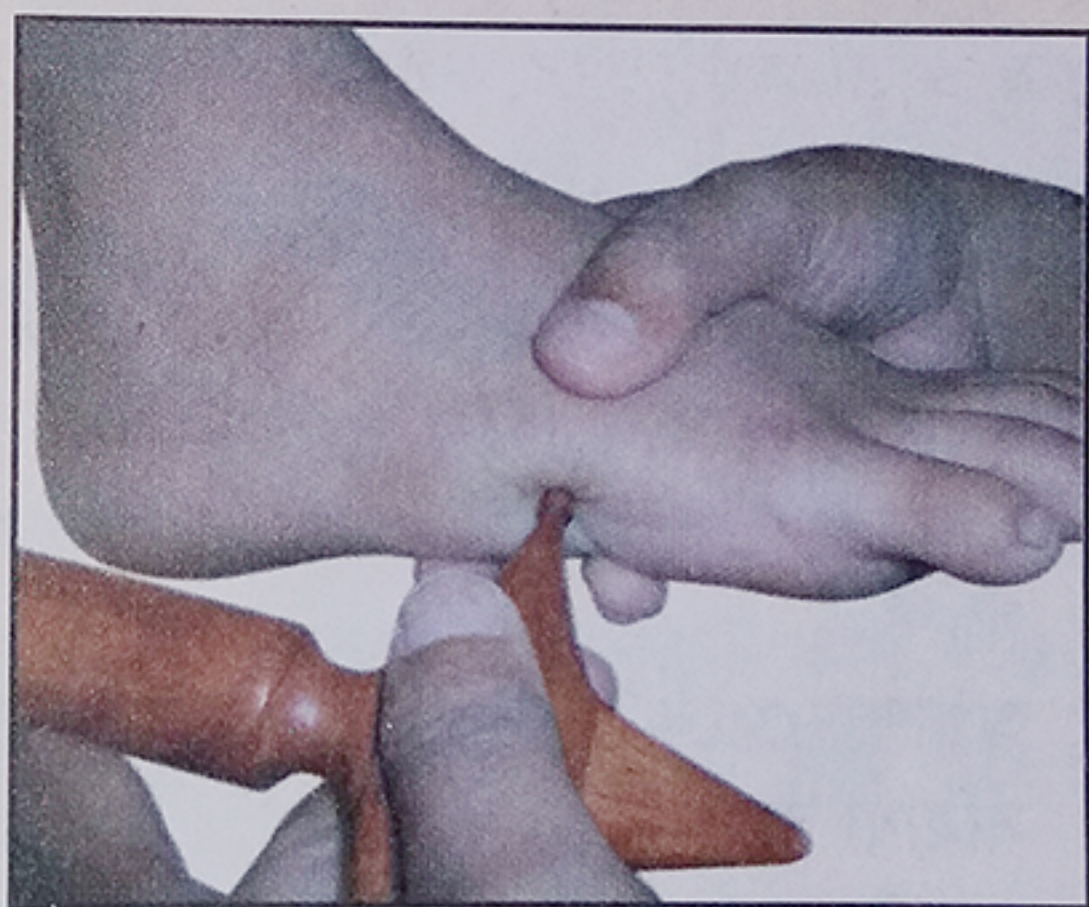
(চিত্র - ৮৭)

ধড়ের সঙ্গে বাহুর সংযোগ স্থল হচ্ছে কাঁধ। এটি সচল সন্ধিগুলোর মধ্যে অন্যতম, কারণ একে ইচ্ছা মতো ঘোরানো-ফেরানো যায়।

সমস্যা - লক্ষণ ঃ

* কাঁধে ব্যথা।
* কাঁধ শির শির করা।
* কাঁধ নাড়াতে না পারা।
* মাংস পেশী কামড়ানো ও টান লাগা।
* জমে যাওয়া কাঁধ (Frozen shoulder)

বিন্দু নং-২৫ : অগ্নাশয় (Pancreas)

(চিত্র - ৮৮)
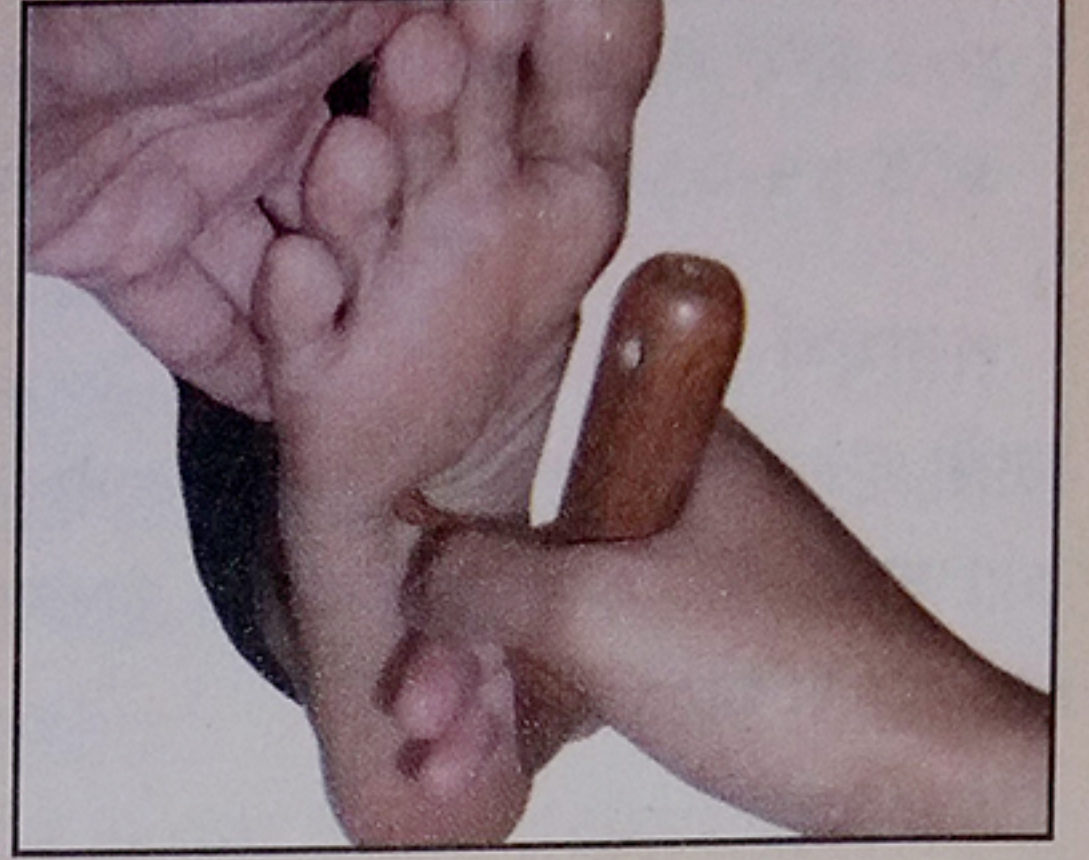
(চিত্র - ৮৯)

অন্তস্রাবী গ্রন্থির অন্যতম অগ্নাশয় বা Pancreas। এটি একটি পাচক গ্রন্থি এবং ইনসুলিন তৈরি করে। উদর গহ্বরে পাকস্থলীর পিছনে ডিওডেনামের দু বাহুর মধ্যে প্রায় আড়া-আড়িভাবে অগ্নাশয় অবস্থিত।

এটি পাতার মতো গোলাপী রংয়ের গ্রন্থি। ডিওডেনামমুখী এর প্রশস্ত অংশকে মাথা (Head), সংকীর্ণ বিপরীত প্রান্তকে লেজ (Tail) এবং মাথা ও লেজের মধ্যভাগকে দেহ (Body) বলে।

কাজ ঃ

* অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত রস, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বিযুক্ত খাদ্য পাচনে সাহায্য করে।
* এ গ্রন্থিতে উৎপন্ন হওয়া ইনসুলিন রক্তে শর্করার সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ইনসুলিনের অভাবেই ডায়াবেটিস রোগ হয়।

সমস্যা ঃ

অগ্নাশয় সঠিকভাবে কাজ করলে তেমন সমস্যার সৃষ্টি হয় না তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম/বেশি কাজ করলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রয়োজনের তুলনায় কম কাজ করলে ঃ

ইনসুলিন সৃষ্টির গতি কমিয়ে দেয়ার ফলে রক্তে শর্করার সঠিক মাত্রা বজায় থাকে না। মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয়।

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কাজ করলে ঃ

* মাথা ব্যথা করে।

* নিম্ন রক্তচাপ হয়।
* মাথা ঝিম ঝিম করে।
* মিষ্টি খাওয়ার এবং মদ্য পানের প্রবল ইচ্ছা।
* মাইগ্রেন সমস্যা দেখা দেয়।

বিন্দু নং-২৬ : বৃক্ক (Kidney)

(চিত্র - ৯০)

(চিত্র - ৯১)

মানুষের উদর গহ্বরের পেছন অংশে। মেরুদন্ডের দু'পাশে বক্ষপিঞ্জরের নিচে ও পৃষ্ঠ-প্রাচীর সংলগ্ন হয়ে দুটি বৃক্ক যুক্ত থাকে। সাধারণত বাম বৃক্কটি ডান বৃক্কের চেয়ে সামান্য নিচে থাকে। প্রতিটি বৃক্ক নিরেট-চাপা, দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো এবং লালচে রংয়ের।

প্রতিদিন কিডনী ১৭৫ লিটার রক্ত ছেঁকে পরিস্কার করে। এর মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। দুটি কিডনীতে প্রায় ২৪ লক্ষ ছাঁকনি আছে।

কাজ ঃ

* রক্ত থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ করে।
* রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।
* রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
* দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।
* ভিটামিন 'ডি' ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেয়।
* দেহে সোডিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

সমস্যা ঃ

কিডনী সঠিক ভাবে কাজ না করলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়-

* প্রস্রাব কম হয় ।
* প্রস্রাবের সময় বা পরে জ্বালা পোড়া ভাব থাকে ।
* প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হয় ।
* প্রস্রাবের রং হলদেটে দেখায় ।
* মুখমন্ডল ও পা ফুলে যায় ।

বিন্দু নং-২৭ : পাকস্থলী (Stomach)
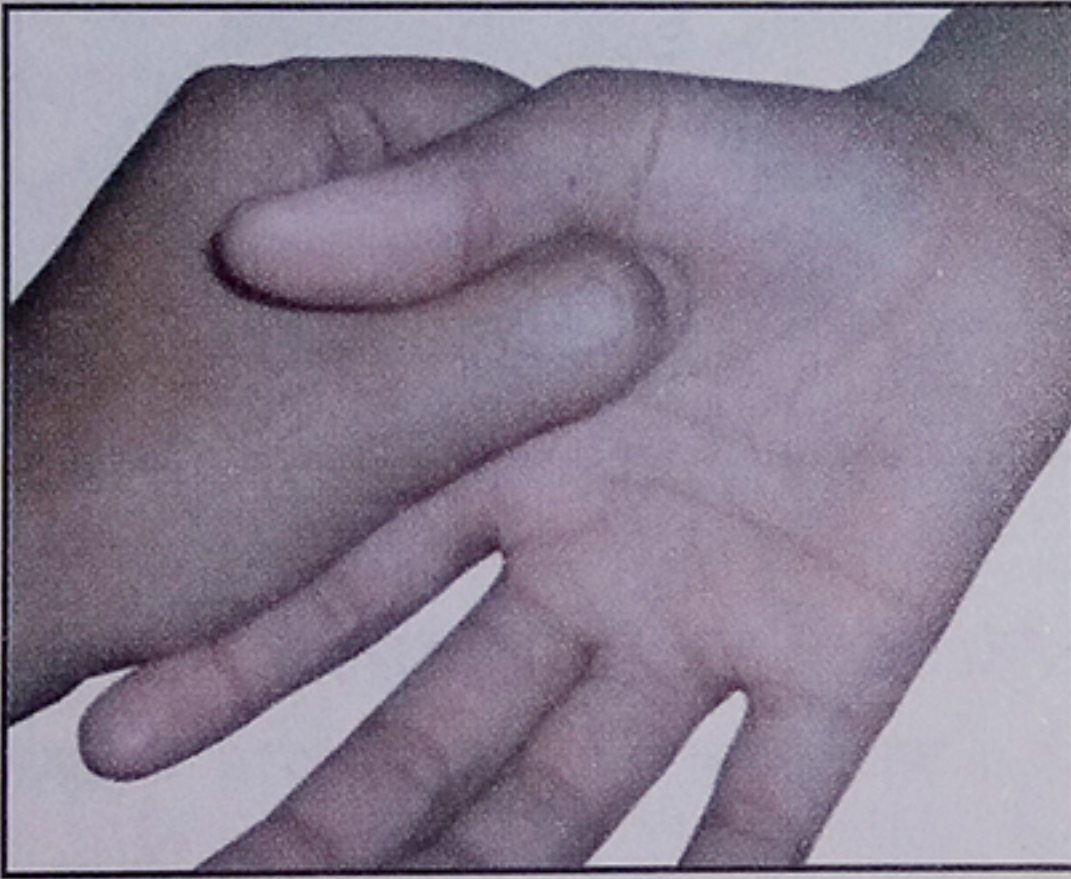
(চিত্র - ৯২)

(চিত্র - ৯৩

পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ ধরে খাদ্য অবস্থান করে । এটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ২৫ সেঃ মিঃ লম্বা এবং ১৫ সেঃ মিঃ চওড়া বাঁকানো থলির মতো । পাকস্থলীতে খাবার হজম প্রক্রিয়া চলে । পাকস্থলীর পাচক রস প্রোটিন পাচনে সহায়তা করে ।

কাজ ঃ

* খাদ্য জমা রাখার কাজ করে ।
* পাচক রস নিঃসরণ করে যার ফলে প্রোটিন ও ফ্যাট অনেকটা হজম হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) খাদ্যকে তরলীভূত করতে সাহায্য করে ।
* জল, গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ও নানা ঔষধ প্রত্যক্ষভাবে রক্তে শোষিত হয় ।
* পাকস্থলী নিসৃত এসিড খাদ্যের সাথে প্রবিষ্ট জীবাণু ধ্বংস করে ।

সমস্যা ঃ

পাকস্থলীতে পাচক রস সঠিকভাবে নির্গত না হওয়ার ফলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়–

* তলপেটের উপরে তীব্র ও প্রচন্ড ব্যথা ।
* খাবারে অরুচি ।
* বমি বমি ভাব ।
* মাথা ব্যথা ।
* মাথা ঘোরানো ।
* পেট ফাঁপা ।
* মুখে দুর্গন্ধ ।
* মুখে ও জিহ্বায় বিস্বাদ আসা ।
* মুখ দিয়ে লালা নিঃসরণ বেড়ে যওয়া ।
* বুক জ্বালা, পেট ভারী / ভার লাগা ।
* জিহ্বায় সাদা প্রলেপ পড়া ।
* কোষ্ঠকাঠিন্য ।
* ডায়রিয়া প্রভৃতি হতে পারে ।

যে সকল কারণে পাকস্থলীর সমস্যা দেখা যায়-

* পর্যাপ্ত না চিবিয়ে খাওয়ার জন্য ।
* অত্যধিক ঝাল, মশলা, তৈলাক্ত খাবার খেলে ।
* বার বার খাবার খেলে ।
* মদ্যপান, ধূমপান ও চা, কফি পান করলে ।
* মানসিক চাপ, হতাশা ও স্নায়বিক দুর্বলতা থাকলে ।
* ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ।
* ঔষধের বিষক্রিয়া ।
* প্রদাহ বা ইনফেকশন হলে ।

বিন্দু নং-২৮ : এড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)
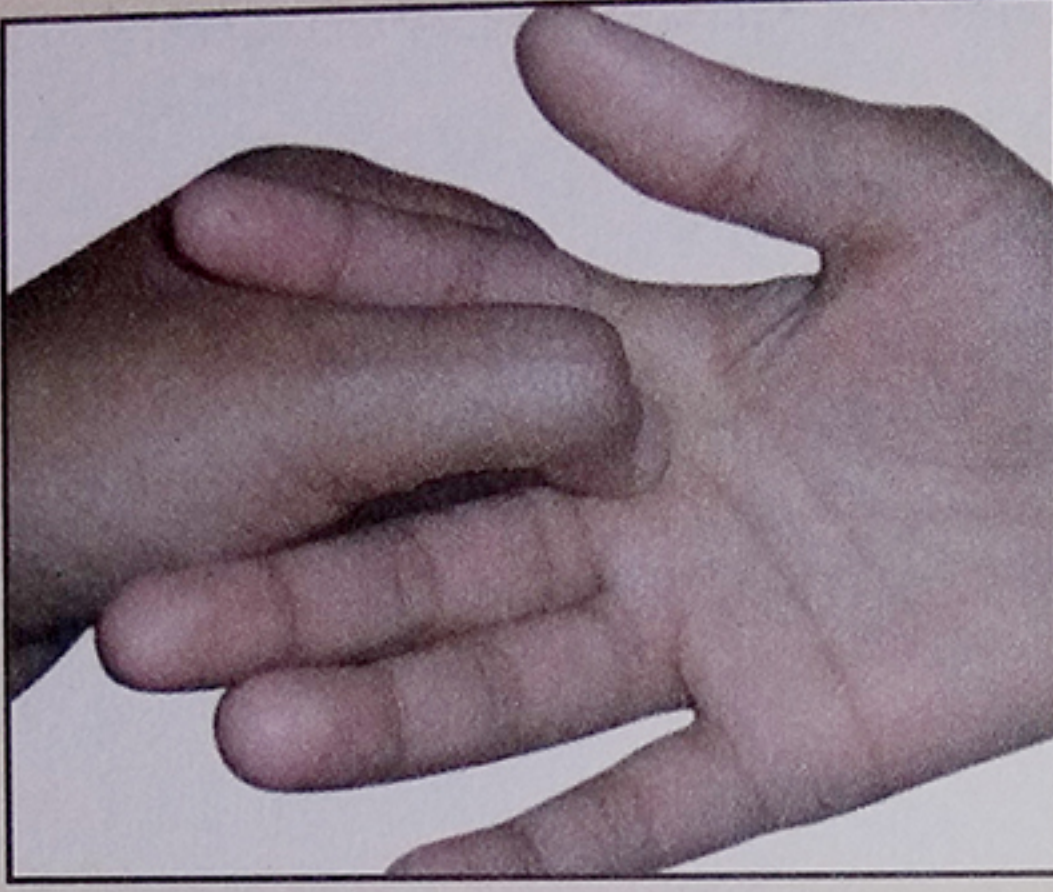
(চিত্র - ৯৪)

(চিত্র - ৯৫)

এড্রিনাল গ্রন্থি একটি হরমোন নিঃসরণকারী গ্রন্থি । এই গ্রন্থিটি ঠিক কিডনীর উপরে মাথার টুপির মতো অবস্থান করে । এটি দু'দিকে দুটি থাকে এবং প্রায় ত্রিভুজাকৃতি হয়ে থাকে । এই গ্রন্থির ওজন প্রায় ১০ গ্রাম । পুরুষের চেয়ে নারীরটি বড় হয় । এড্রিনাল দেহের অগ্নিতত্ত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে; তাই প্লীহা, যকৃত এবং পিত্তাশয়েরও নিয়ন্ত্রক ।

কাজঃ-

সঠিকভাবে কাজ করলে ঃ

* এড্রিনাল থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের খনিজ ও জলীয় বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে ।
* দেহের পেশীকে সজাগ ও কর্মক্ষম করে তোলে ।
* রক্ত জমাট বাঁধায় ।
* প্লীহাতে চাপ দেয় এবং তার ফলে রক্তে লোহিত কণিকা বৃদ্ধি পায় ।
* চোখের পাতাকে টেনে ধরে রাখে ।
* এটি শিশু কিশোরদের সময়মত যৌন পরিবর্তন ঘটাতে ভূমিকা রাখে ।

এড্রিনাল সঠিকভাবে কাজ না করলে যেসব সমস্যা দেখা যায়-

* হজমের গোলমাল দেখা দেয় ।
* উচ্চ রক্তচাপ দেখা যেতে পারে ।
* দেহের তাপমাত্রা কমে যায় ।
* প্রস্রাবের চাপ কমে যায় ।

* দেহে চর্বি বেশি জমে ।
* মানসিক উন্নয়ন কমে যায়, নড়াচড়া করার ক্ষমতা কমে যায় ।
* যৌন ক্ষমতা কমে যায় ।
* পুরুষের নপুংসকতা ও নারীদের সন্তানধারণ ক্ষমতা লোপ হয়ে থাকে ।
* বমি-বমি ভাব, মাথা ব্যথা হয় ।
* লালসা পূরণে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে ।
* কোন কোন ক্ষেত্রে আত্ম গরিমায় ভোগে ।
* মানসিক চিন্তাশক্তি কমে যায় ।
* প্রচুর প্রস্রাব হয়ে থাকে ।

এড্রিনাল গ্রন্থির সঠিক কার্যক্রম চরিত্র গঠনে সাহায্য করে । তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, পরিশ্রম, কাজে উৎসাহ, অন্তর্নিহিত শক্তি, সাহস সব কিছুর পেছনে এড্রিনাল গ্রন্থি সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।

বিন্দু নং-২৯ : নাভিচক্র (Solar Plexus)

(চিত্র - ৯৬)

(চিত্র - ৯৭)

নাভির নিচের সকল গ্রন্থিমালার নিয়ন্ত্রক এই নাভিচক্র । যেহেতু নাভির নিচে হজম শক্তি থেকে শুরু করে সকল ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে সে কারণে নাভিচক্র সঠিক স্থানে আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে ।

নাভিচক্র অনেক সময় উপরে অথবা নিচে সরে যায় । পেটে গ্যাস হলে এবং ভারী কিছু উত্তোলন করলে নাভিচক্র সরে যায় ।

সমস্যা / লৰণ ঃ

* উপরে সরে গেলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয় ।
* নিচে সরে গেলে পাতলা পায়খানা হয় ।
* মেয়েদের তলপেট ব্যথা হয় ।
* বুকে ব্যথা হয় ।
* দীর্ঘদিন নাভিচক্র সরে থাকলে হজম ৰমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় ।

সমাধান ঃ

* সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং সন্ধ্যায় নাভিচক্র যথাস্থানে আছে কিনা পরীৰা করা এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় তা যথাস্থানে আনার পথ অনুসরণ করা উচিত ।

বিন্দু নং-৩০ : ফুসফুস (Lungs)
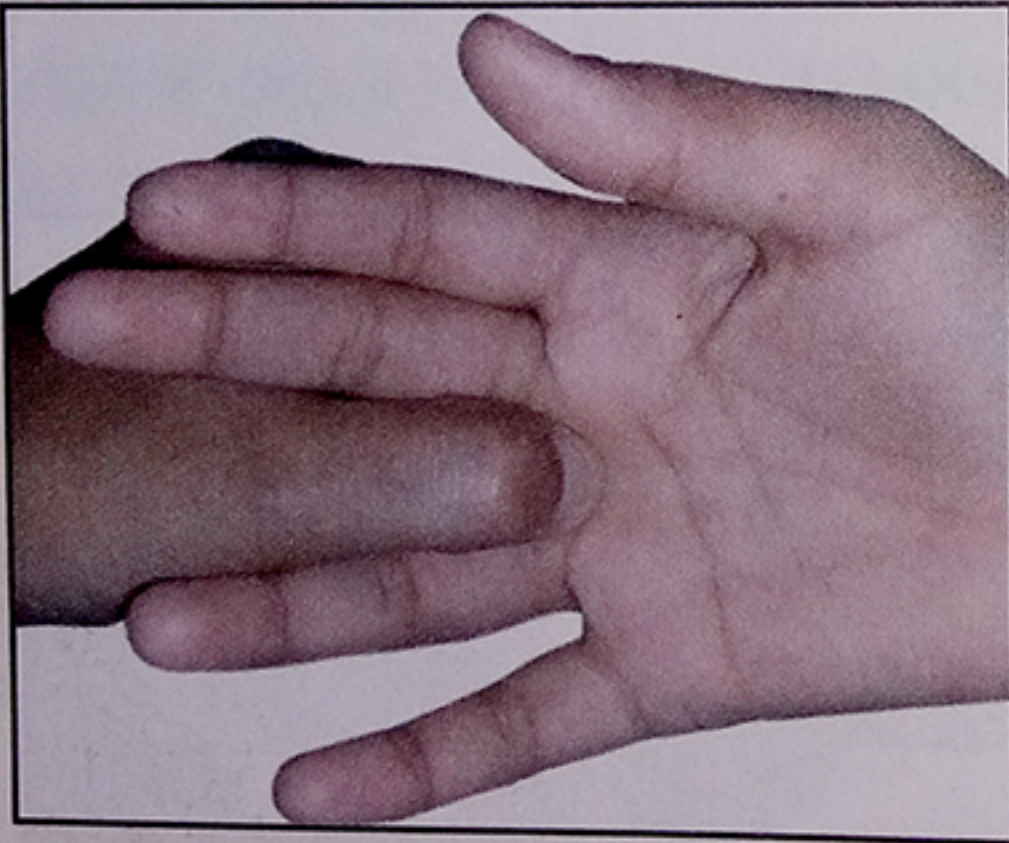
(চিত্র - ৯৮)

(চিত্র - ৯৯)

ফুসফুস হচ্ছে শ্বাসযন্ত্র, যার মাধ্যমে মানুষ শ্বাস গ্রহণ করে ও ত্যাগ করে । এটি হালকা গোলাপী রঙের স্পঞ্জের মত নরম অঙ্গ ।

বুকের খাঁচার ডান দিকে ও বাম দিকে এই ফুসফুস দুটি অবস্থিত । প্লুরা (Pleura) নামে দ্বিস্তরী একটি পাতলা আবরণে আবৃত থাকে দুটি ফুসফুস । বাম ফুসফুসটি আকারে ছোট, ওজনে ৫৬৫ গ্রাম ও দুই খন্ড (Lobe) বিশিষ্ট এবং ডান ফুসফুসটি আকারে বড় ও তিন খন্ডবিশিষ্ট ।

কাজ ঃ

* দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে ।
* শ্বাস প্রশ্বাসের কাজে সহায়তা করে ।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* গলা ব্যথা / গলায় ক্ষত ।
* টনসিল গ্রন্থির প্রদাহ ও টনসিল গ্রন্থির বৃদ্ধি ।
* গলগন্ড রোগ ।
* ডিপথেরিয়া ।
* স্বর ভাঙ্গা ।
* কাশি / হুপিং কাশি / রক্ত কাশি ।
* হাঁপানী ।
* শ্বাস নালীর প্রদাহ বা ব্রংকাইটিস ।
* বুক ব্যথা ও পার্শ্ব ব্যথা ।
* ঘন ঘন নিঃশ্বাস কষ্ট ।

বিন্দু নং-৩১ : কান (Ear)

(চিত্র - ১০০)

(চিত্র - ১০১)

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কান অন্যতম। চোখের মতোই মাথার দু'টি টেম্পোরাল হাড়ে (Temporal bone) দু'টি গর্ত থাকে। এই কানই হচ্ছে আমাদের শ্রবণ যন্ত্র। এই কান দিয়েই বাইরের শব্দ ভিতরের কর্ণপটে গিয়ে পৌঁছায়।

প্রত্যেক কানের তিনটি অংশ থাকে ঃ

১. বহিঃকর্ণ,
২. মধ্য কর্ণ,
৩. অন্তঃকর্ণ ।

কাজ ঃ

* সংবাদ বা সংকেত সংগ্রহ করে তা কানের ভিতর নিয়ে যায় এবং কম্পন সৃষ্টি করে শব্দের প্রখরতা বৃদ্ধি করে ।
* অস্থির মাধ্যমে সংকেতকে প্রতিবিম্বিত করে অন্তঃকর্ণেও জালের মতো পদার্থে সঠিক কম্পন তোলে ।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* কানে কম শোনা ।
* কানে শব্দ হওয়া ।
* কানে পুঁজ হওয়া ।
* কান পাকা ।
* কানে ব্যথা ।

বিন্দু নং-৩২ : শক্তি (Energy)

(চিত্র - ১০২)

(চিত্র - ১০৩)

শরীর ও মস্তিস্ক যাতে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য শক্তির খুবই দরকার । আর এ জন্যই আমরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি ।

সমস্ত রকম প্রাকৃতিক খাদ্য ফল, তরকারি, শস্য ডাল ইত্যাদির মধ্যে প্রায় সমান পরিমাণ সূর্যের ধণাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি আছে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা শক্তি অর্জন করি।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* ক্লান্তি বোধ বা বিনিদ্র রাত্রি যাপন করার ফলে শক্তির অভাব দেখা দেয়।
* অলসতা।
* কাজে নিরুৎসাহিত ভাব দেখা যায়।

বিন্দু নং-৩৩ : কানের স্নায়ু (Auditory Nerves)
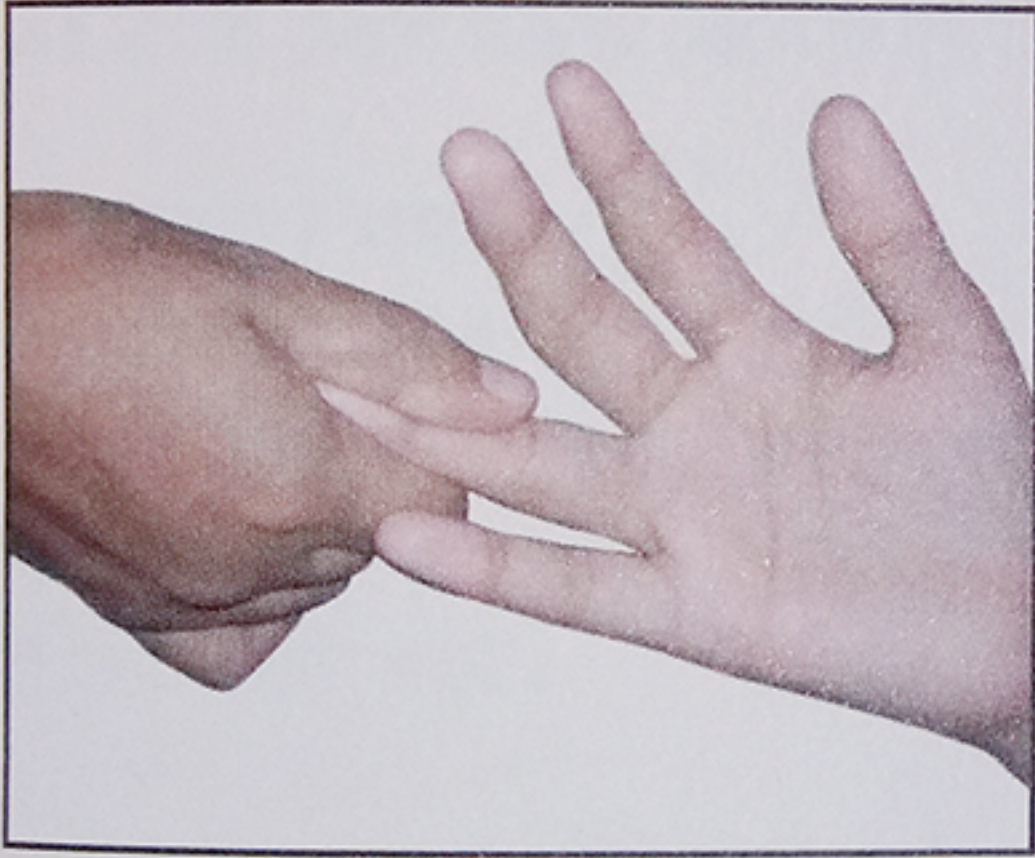
(চিত্র - ১০৪)

(চিত্র - ১০৫)

অসংখ্য সুক্ষ্ণ স্নায়ুতে বিভক্ত হয়ে এটি অন্তঃকর্ণের গায়ে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাইরের শব্দ তরঙ্গ কর্ণের ছিদ্র দিয়ে কানের ড্রামে বা কর্ণপটে এসে আঘাত করে, সেই আঘাত প্রতিফলিত হয় মধ্যকর্ণে।

এই শব্দের স্পন্দন মধ্যকর্ণের তিনটি অস্থির মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে প্রেরিত হয় অর্থাৎ তা অন্তঃকর্ণের তরল পদার্থে যে স্পন্দন তোলে তাই স্নায়ুর মাধ্যমে চলে যায় মস্তিস্কে। এভাবেই আমরা শুনতে পারি।

বিন্দু নং-৩৪ : ঠান্ডা (Cold)

(চিত্র - ১০৬)
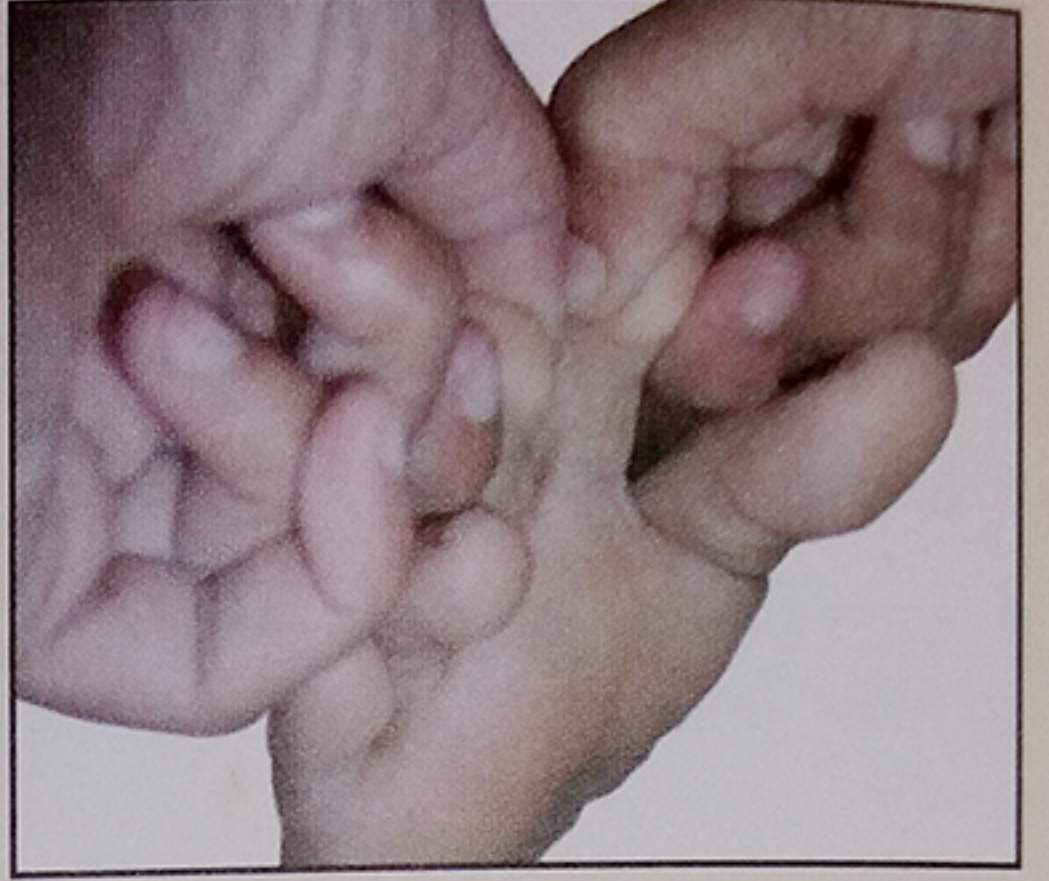
(চিত্র - ১০৭)

অত্যধিক ঠান্ডার কারণে যে সব সমস্যা দেখা যায়-
* ঘন ঘন সর্দি ।
* অতিরিক্ত মাথা ব্যথা ।
* নাক দিয়ে পানি পড়া ।
* অতিরিক্ত হাঁচি ।

বিন্দু নং-৩৫ : চোখ (Eye)

(চিত্র - ১০৮)

(চিত্র - ১০৯)

চোখ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় । চোখ দুটি হলো ক্যামেরা ও প্রজেক্টরের সাথে তুলনীয় । চোখকে বাইরে থেকে একটা কাঁচের পর্দার মত দেখালেও তা আসলে

একটি বাঁকা গোলকের মত, ডিমের মত। সামনের দিকে একটা স্বচ্ছ আবরণী থাকে যেটাকে কর্ণিয়া বলে। কর্ণিয়া স্বচ্ছ বলেই আলোক রশ্মি চোখের ভেতরে ঢুকতে পারে।

চোখের কর্ণিয়া জানালার কাজ করে যার ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে। আইরিস আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্ধকারে চোখের পর্দা বড় হয়ে খুলে যায় যাতে বেশি আলো ভিতরে আসতে পারে। বেশি আলোতে এটি ছোট হয়ে আলো নিয়ন্ত্রণ করে।

চোখের মণির অভ্যন্তরে বহু ক্ষুদ্র স্নায়ুনালী এখানে সংযুক্ত হয় এবং আলো নড়লে এগুলোর উপরে প্রতিক্রিয়া হয়। এর ভিতরে ক্ষুদ্র কোষ আছে যাদের রড (Con) ও কোন (Cone) বলে। আলো পড়লে কোন উত্তেজিত হয় রড কম আলোতে আমাদের দেখতে সাহায্য করে। 'অপটিক স্নায়ু' মস্তিস্কে সংকেত বহন করে। আর এর দ্বারাই চোখে মস্তিস্ক থেকে বিদুৎ প্রবাহের মত সংকেত আসে।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* চোখে কম দেখা
* চোখ দিয়ে পানি পড়া / চোখ চুলকানো / চোখের জ্বালা ভাব।
* অঞ্জনী।
* চোখে ছানি পড়া।

বিন্দু নং-৩৬ : হৃৎপিন্ড (Heart)

(চিত্র - ১১০)

(চিত্র - ১১১)

হার্ট বা হৃৎপিন্ড একটি অবিশ্রান্ত পাম্প। এটি দেখতে অনেকটা আতা ফলের মতো। হাত মুঠো করলে যত বড় দেখায় হৃৎপিন্ডের আকার ঠিক তেমন। যার সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত সংগৃহীত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়।

একজন নিষ্ক্রিয় মানুষের হৃৎপিন্ড মিনিটে ৭৪ বার সংকোচন ও প্রসারণ হয়। যে সব ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রম করেন তাদের হৃৎপিন্ড মিনিটে ৫০ থেকে ৬০ বার সংকোচন ও প্রসারণ হয়।

কাজ ঃ

* হৃৎপিন্ড বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয়।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* বুকের বাম পাশে ব্যথা অনুভূত হয়।
* বুক aodo করে।
* বাম হাত ব্যথা ও অবশ মনে হতে পারে।
* উত্তেজিত হলে হাত-পা কাঁপে।

বিন্দু নং-৩৭ : প্লীহা (Spleen)

(চিত্র - ১১২)

(চিত্র - ১১৩)

প্লীহা একটি ঘন কালচে লাল রঙের গ্রন্থি যা হার্টের চেয়ে আকারে সামান্য ছোট হয়ে থাকে। এটি উদরের বাঁ দিকে ও পাকস্থলীর ঠিক পিছনে অবস্থিত। এটা দেখতে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো। এর স্বাভাবিক ওজন প্রায় ২৫০ গ্রাম।

কাজ ঃ

* রক্ত শোধন করে ।
* রক্ত কণিকা গঠনে কাজ করে ।
* প্লীহা দেহে রোগ প্রতিরোধক শক্তি তৈরি করে ।
* দেহের জীবাণূ ধ্বংস করার কাজে সহায়তা করে ।

সমস্যা / লক্ষণ ঃ

* রক্ত দূষিত হয়ে যেতে পারে ।
* রক্ত স্বল্পতা দেখা দিতে পারে ।
* চর্মরোগ দেখা দিতে পারে ।

বিন্দু নং-৩৮ : থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)
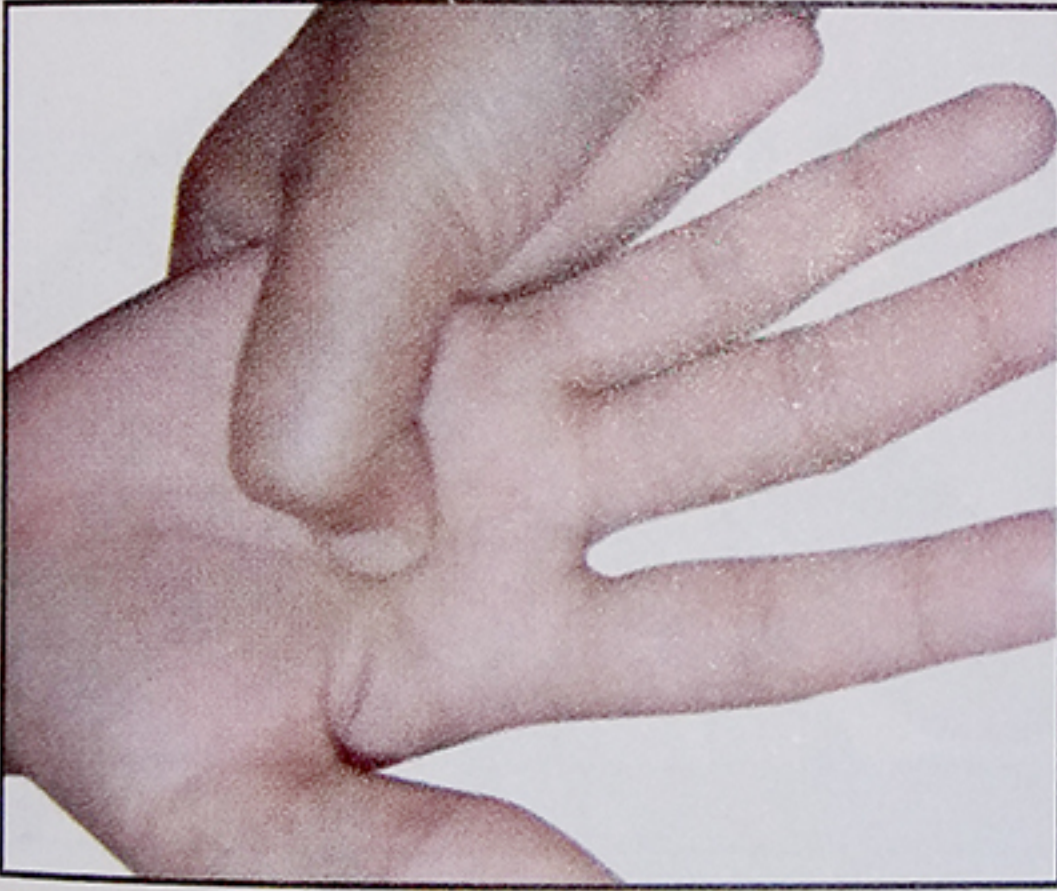
(চিত্র - ১১৪)

(চিত্র - ১১৫)

থাইমাস গ্রন্থি একাধারে অন্তস্রাবী ও লসিকা গ্রন্থিরূপে পরিগণিত । দেহের শ্বাস নালীর সামনে থাইরয়েড গ্রন্থির নিচের ভাগে থাইমাস গ্রন্থিটি অবস্থিত । শিশুর জন্য এই গ্রন্থিটি ধাত্রী মা স্বরূপ ।

এই গ্রন্থি শিশুকে সমস্ত রোগ থেকে রক্ষা করে । শৈশবে গ্রন্থিটি আকারে বেশ বড় হয় । বয়ো:সন্ধিকাল পর্যন্ত এই গ্রন্থি বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে আকারে ছোট হয়ে গিয়ে তার কাজ বন্ধ করে দেয় । এই গ্রন্থি থাইমোসিন নামক একটি হরমোন ক্ষরণ করে থাকে ।

কাজ ঃ

* শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও দেহ গঠনে সহায়তা করে ।

* দেহে এন্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করে।
* দেহ অস্থিতে খনিজ ধাতুর সঞ্চয় করে অস্থি শক্ত ও মজবুত করে।
* ভ্রূণের থাইমাস গ্রন্থি হতে যথেষ্ট পরিমাণে হরমোন ক্ষরণের ফলে গর্ভধারণের দ্বিতীয়ার্ধে গর্ভবতী জননীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়ে থাকে।

সমস্যা - লক্ষণ ঃ

* শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
* শিশু জড় বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং সবসময় অসুস্থ থাকে।

* বাম স্তন/ ডান স্তন : (Left/ Right Breast; L.B/ R.B)

(চিত্র - ১১৬)

(চিত্র - ১১৭)

সমস্যা ঃ

স্তনে ব্যথা, ফোলা, চুলকানো, মাঝে মাঝে স্তন ভারী হলে, কোন টিউমার বা গোটা মত মনে হলে, মাসিকের সময়, পূর্বে বা পরে স্তন ব্যথা বা ভারী হলে, কখনো কখনো হঠাৎ চিলিক দিয়ে ব্যথা হলে, ঝাঁকুনিতে ব্যথা হলে, স্তন ক্যান্সার হলে L.B/ R.B বিন্দুতে উপচার করতে হবে।

হাতের তালুর উল্টোপিঠে মধ্যমা বরাবর ঠিক মাঝখানে L.B/ R.B;

* স্নায়ু বিন্দু : (N.P. Nerval Point)

(চিত্র - ১১৮)

(চিত্র - ১১৯)

স্নায়ু চাপ, অনিদ্রা, হাত-পা চিবানো, অবশ অবশ ভাব, নি:শক্তিবোধ, আঙ্গুলের জড়তা, প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত প্রভৃতি সমস্যার জন্য N.P. বিন্দুতে উপচার করতে হয়।

হাতের এবং পায়ের আঙ্গুলের হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে চাপ দিতে হবে।

* M.F. (Middle Finger)

(চিত্র - ১২০)

(চিত্র - ১২১)

মানসিক দুশ্চিন্তা, দাঁত ও হাতের যেকোন অংশে ব্যথা, অজ্ঞান হয়ে গেলে, হার্টের সমস্যায় M.F. বিন্দুতে উপচার করতে হবে।

* সায়াটিকা (Sciatica)
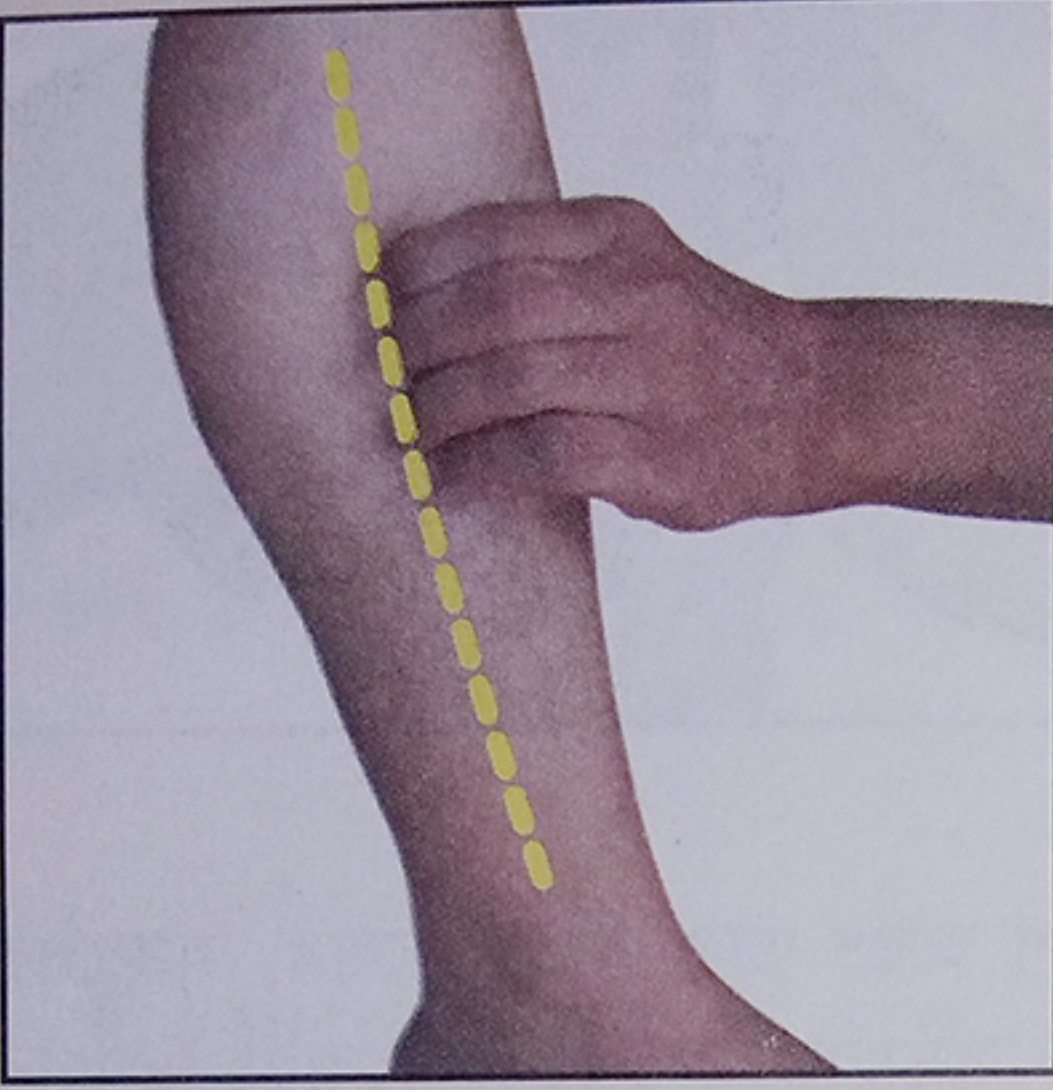
(চিত্র - ১২২)
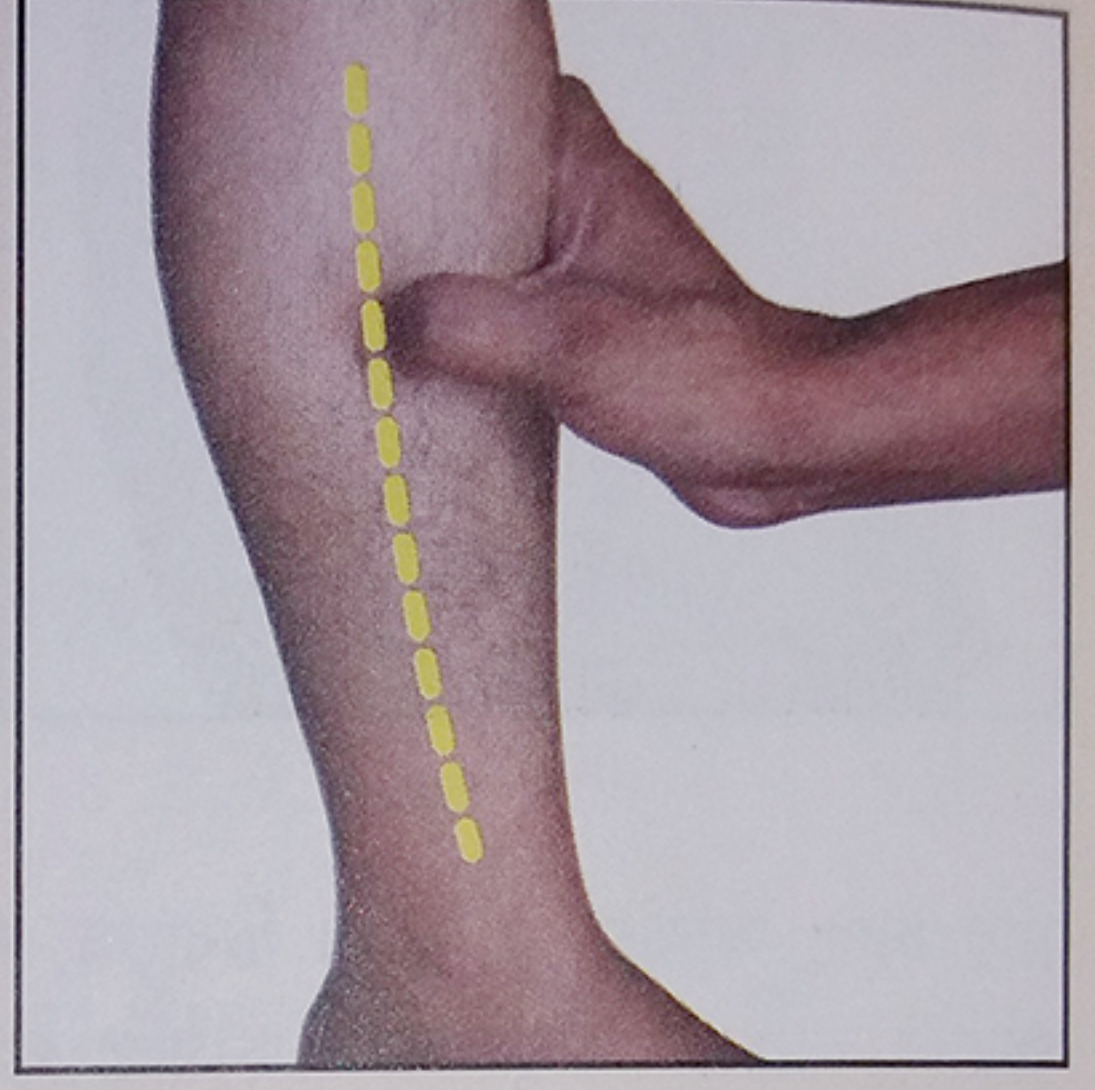
(চিত্র - ১২৩)
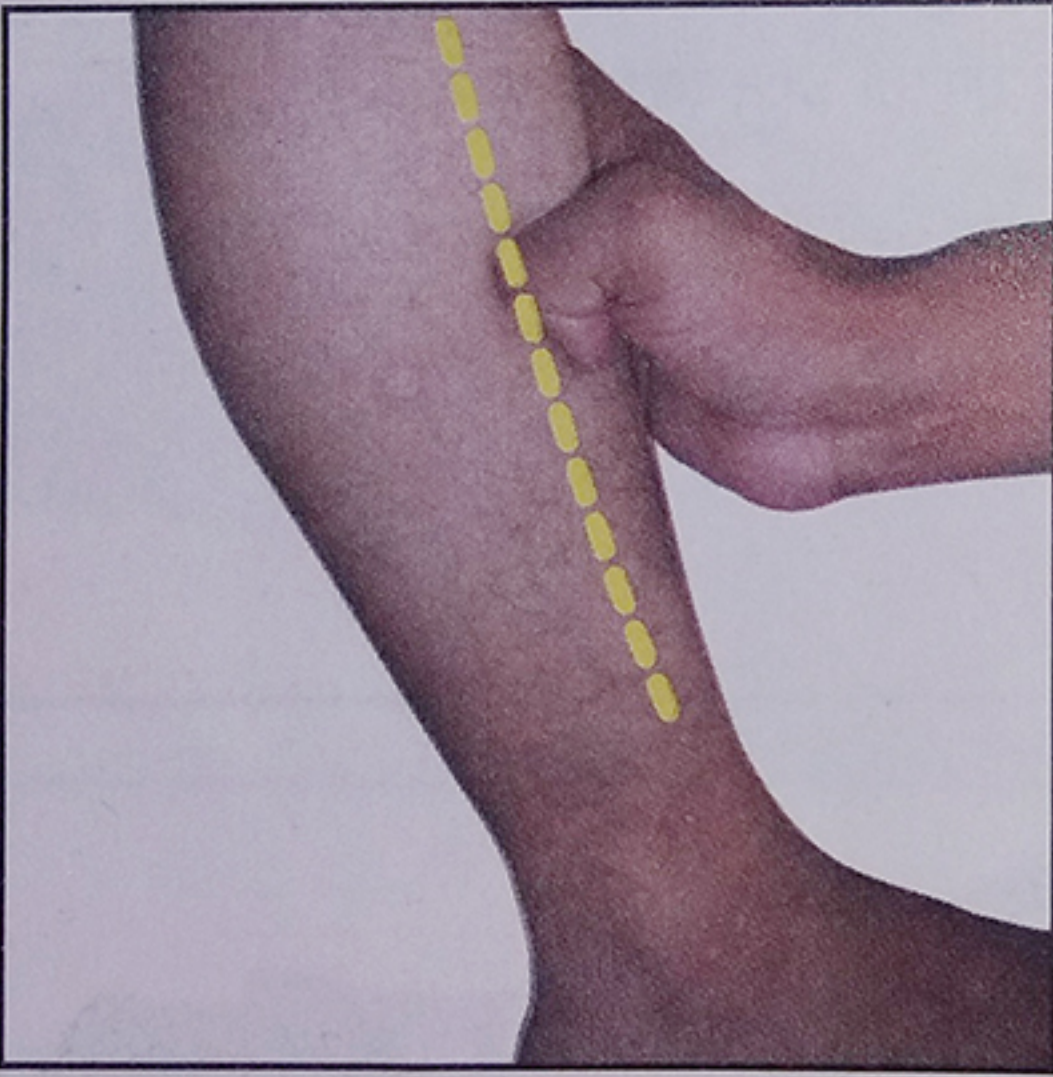
(চিত্র - ১২৪)
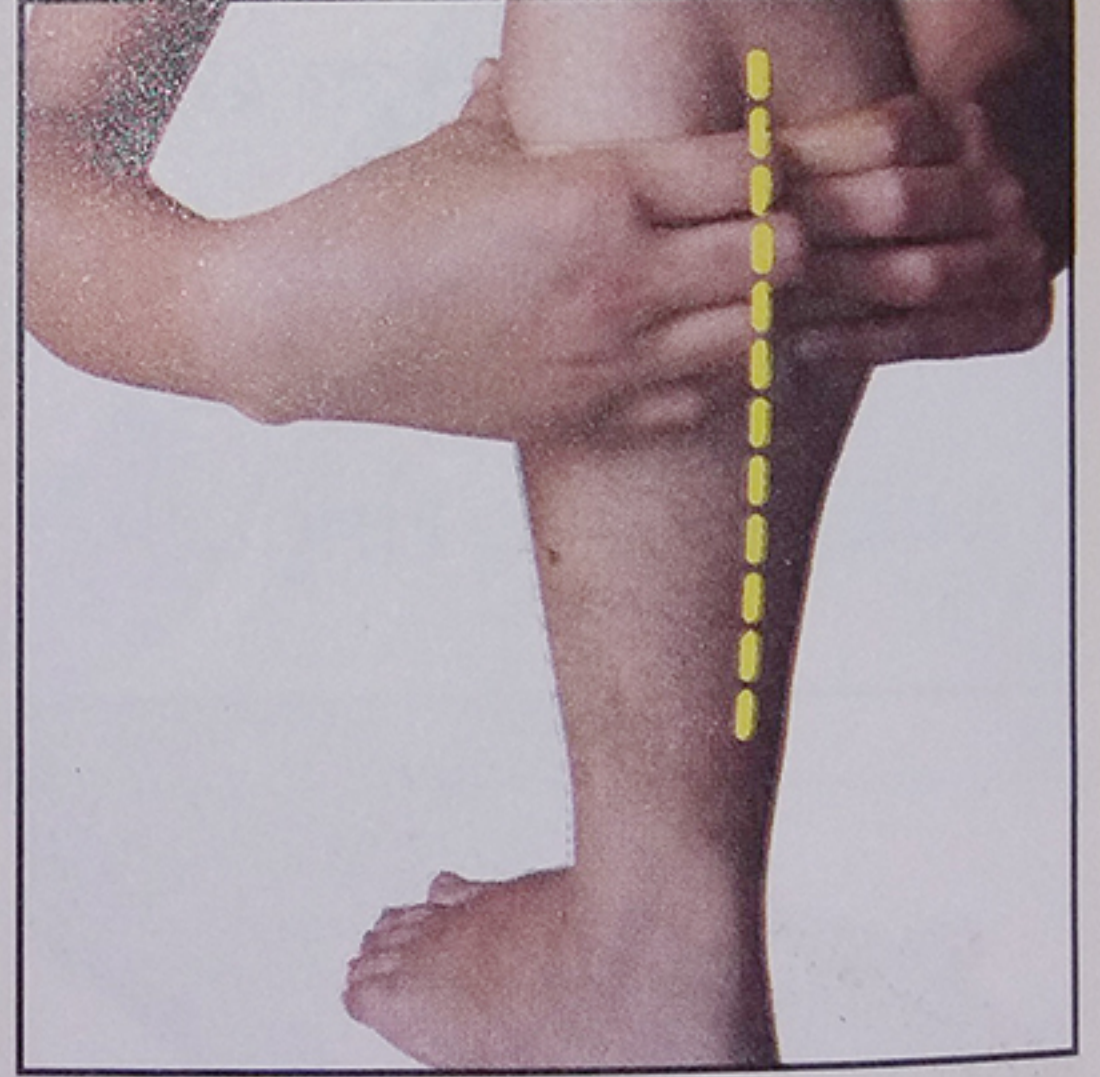
(চিত্র - ১২৫)

সায়াটিক স্নায়ুর প্রচাপন বা আঘাতের ফলে এই স্নায়ুর বিতরণ এলাকায় যে ব্যথার সৃষ্টি হয় তাকে সায়াটিকা বলে। সায়াটিক স্নায়ু, বস্তিকোটরের পশ্চাদভাগে অবস্থিত মেরুরজ্জু থেকে নির্গত এল-৪, এল-৫, এস-১, এস-২, এস-৩ এই পাঁচটি মেরু স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত। নিতম্বের নিম্নভাগ থেকে নির্গত হয়ে উরু ও পায়ের পিছন দিকে নেমে গিয়ে পদতল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

কোন কারণে কোমরের কাছে মেরুদন্ডের কোন কশেরুকার চাকতি নড়ে গিয়ে পিছনের দিকে সরে গেলে সায়াটিক স্নায়ুর গোড়ায় চাপ পড়ে।

আর এর ফলে কোমর থেকে পায়ের নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত স্নায়ুশূল, অনুভূতিহ্রাস এমনকি প্যারালাইসিস পর্যন্ত হতে পারে।

সমস্যা ঃ
মাংসপেশীতে ব্যথা, শিরা টান পড়া, কোমর ও হাঁটু ব্যথা, অনিদ্রা, মেরুদন্ড সোজা করতে না পারা, বেশিক্ষণ দাঁড়ালে পায়ে ব্যথা প্রভৃতি।

* এলার্জী (Allergy)
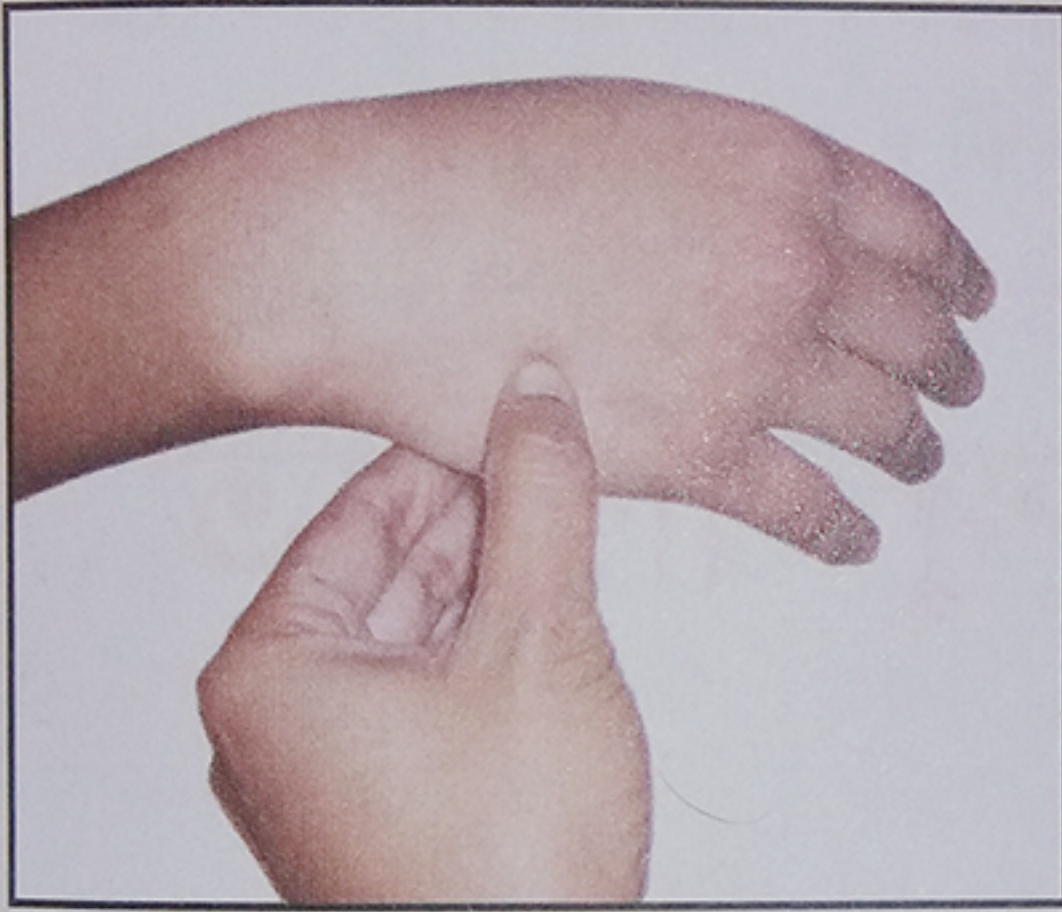
(চিত্র - ১২৬)

জন্মগতভাবে কোন কোন ব্যক্তির কোন বস্তুর প্রতি অত্যানুভূতি থাকে। এর ফলে ঐ বস্তুর সংস্পর্শে আসা মাত্র দেহের শ্বেতকণিকার কিছু নির্দিষ্ট কোষে বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ঐসব কোষ রক্তের ভিতরে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নি:সরণ করে যা ঐ বস্তুর সাথে প্রতিক্রিয়া করে দেহে কিছু পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, কারো চর্মে চুলকানিযুক্ত লাল লাল উদ্ভেদ দেখা দেয়, কারোবা হাঁচি, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। দেহের এই প্রতিক্রিয়াকেই এলার্জী বা অত্যানুভূতিশীলতা বলে।

এটা খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, গন্ধ, আবহাওয়ার পরিবর্তন, কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা ঔষধের প্রতিও হতে পারে।

পরিচ্ছেদ-৬

গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু পরিচিতি

পরিচ্ছেদ সূচি

১. গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু কোন্‌গুলো?

স্বাভাবিক অবস্থায়, বলা যায় সর্বাবস্থায়, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বিন্দুগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু (ভিআইপি) হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এরা হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থির বিন্দু (বিন্দু নং ৩), পিনিয়াল গ্রন্থির বিন্দু (বিন্দু নং ৪), থাইরয়েড/ প্যারাথাইরয়েডের বিন্দু (বিন্দু নং ৮), এড্রিনাল গ্রন্থির বিন্দু (বিন্দু নং ২৮), প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির বিন্দু (বিন্দু নং ২৫), অন্ত্রগুচ্ছের বিন্দু (বিন্দু নং ২৯), যৌন গ্রন্থির বিন্দু (বিন্দু নং ১১-১৫) এবং থাইমাস গ্রন্থির বিন্দু (বিন্দু নং ৩৮)।

এদের মধ্যে পিটুইটারী, পিনিয়াল ও থাইরয়েড/প্যারাথাইরয়েড বিন্দু তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ (ভিভিআইপি)। অপরদিকে, থাইমাস গ্রন্থির বিন্দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী কেবলই শিশুদের জন্য, যাদের বয়স সাধারণত ১২-১৫ বছরের মধ্যে। এছাড়া যকৃতের (লিভার) বিন্দু নং ২৩, হৃৎপিন্ডের (হার্ট) বিন্দু নং ৩৬ এবং কিডনীর বিন্দু নং ২৬ গুরুত্ব বহন করে।

২. অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি কি?

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরস্থ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি যেগুলো থেকে নিঃসরিত এক বা একাধিক হরমোন সরাসরি রক্তে গিয়ে মিশে যায়। বিপরীতে বহিস্রাবী নামে অভিহিত দেহের অন্যান্য গ্রন্থিগুলো থেকে রস কোন না কোন নালীর মধ্য দিয়ে নিঃসরিত হয়।

মানুষের দেহে নয়টি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি রয়েছে; এগুলো হল পিটুইটারী গ্রন্থি, পিনিয়াল গ্রন্থি, থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি, থাইমাস গ্রন্থি, এড্রিনাল গ্রন্থি ও প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি এবং যৌনগ্রন্থিদ্বয় অন্ডকোষ ও ডিম্বকোষ। এছাড়া গর্ভবর্তী নারীর গর্ভফুলও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে।

৩. অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি কি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান?

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এনাটমি ও ফিজিওলজীতে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির বিবরণ ও এর বিস্তারিত কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো ভারতীয় যোগীগণ ৬,০০০ (ছয় হাজার) বছর পূর্বে, আয়ুর্বেদেরও আগে অন্ত:স্রাবী গ্রন্থিসমূহের গুরুত্ব ও কার্যক্ষমতা সম্পর্কে জানতেন।

যোগীগণ এই অন্ত:স্রাবী গ্রন্থিগুলোকে চক্র নামে অভিহিত করে গিয়েছেন। এই চক্রসমূহ যে দেহের নিয়ন্ত্রক তা তাঁরা বলেছেন। এই গ্রন্থিগুলো শুধু মানুষের দেহ মনের গঠনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, যোগীগণ দেখিয়েছেন মানুষের চেহারা ও চরিত্র গঠনও করে থাকে।

৪. অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন?

দু'টি কারণে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, দেহের এই গ্রন্থিগুলো গোটা দেহ পরিচালনায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। এরা পরস্পরের সহায়কও বটে।

একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়লে এবং তা দিনের পর দিন অপরিবর্তিত থাকলে বা আরও বেড়ে উঠতে থাকলে সেক্ষেত্রে অন্য কোন কারণ না ঘটলেও অন্যান্য গ্রন্থিগুলোও ধীরে ধীরে একটির পর একটি আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির চিকিৎসা করার সময় একই সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে অন্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলোতেও চাপ দেয়া দরকার অর্থাৎ চিকিৎসা করা দরকার।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি অন্য যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে এই গ্রন্থিগুলো ঠিকমত কাজ করতে না পারলে মানুষের স্বভাবও প্রভাবিত হয়। এরা কেবল দেহ ও মনের গঠনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি ও চরিত্র গঠনেও ভূমিকা রেখে থাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।

এড্রিনাল গ্রন্থি যথাযথভাবে কাজ করতে না পারলে যকৃতের কার্যাবলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ ভীরু, খিটখিটে ও বদ স্বভাবের হয়ে পড়ে। এটি প্লীহা, যকৃৎ ও পিত্তাশয়ের নিয়ন্ত্রক।

যৌনগ্রন্থিমালায় সমস্যা দেখা দিলে আক্রান্ত মানুষটি স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, নিন্দুক, কামুক ও রাগী স্বভাবের হয়। এই গ্রন্থিমালা বিগড়ালে ছেলেরা হস্তমৈথুন করে, স্বপ্নদোষে আক্রান্ত হয়, লাজুক হয়ে পড়ে, গোঁফ-দাড়ি বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃস্রাবে সমস্যা হয়, ফলে দেহে ব্রণ ও অত্যধিক তাপ দেখা দেয় অথবা কখনো কখনো অত্যধিক রক্তপাত হয়ে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এতে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

পিটুইটারী গ্রন্থি সকল গ্রন্থির রাজা, এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও বিচার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একদিকে যেমন দেহের বৃদ্ধিকে চালনা করে তেমনি এই গ্রন্থি মন ও বুদ্ধির বিকাশকেও পরিচালনা করে। এই গ্রন্থি পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় থাকলে বিরাট প্রতিভাবান হয়ে ওঠে। এটি ঠিকভাবে কাজ না করলে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। মানুষ নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে।

থাইরয়েড-প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যার জন্যও মানুষ নির্মম স্বভাবের হয়ে থাকে। এছাড়া থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ঠিকভাবে কাজ না করলে শারীরিক দুর্বলতা, পেশীতে মোচড় ধরাসহ নানান অসুখ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে শিশুদের রিকেট ও খিঁচুনী হয়ে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়; শিশু স্থুল ও জড় হয়ে পড়ে।

অপরদিকে এই গ্রন্থি অধিক মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের অতিবৃদ্ধি, চোখ ঠিকরে আসা, গলগন্ড ও কন্ঠের হাড় বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। যৌন গ্রন্থির সমস্যার জন্য মেয়েদের মাসিকের সমস্যা হয়, যা থেকে ব্রণ ও দেহে অত্যধিক তাপ দেখা দেয়। এর ফলে কখনো কখনো অধিক রক্তপাত থেকে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। যা দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে।

অগ্নাশয় গ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তার ফলে ডায়াবেটিস দেখা দেয়। আবার এই গ্রন্থির অধিক সক্রিয়তার জন্য নিম্ন রক্তচাপ ও মাইগ্রেন হয়ে থাকে।

পিনিয়াল গ্রন্থি আক্রান্ত হলে উচ্চ রক্তচাপ, অকালে যৌনতার বিকাশের মত সমস্যা দেখা দেয়। একে বলা হয় আদিম তৃতীয় চক্ষু, এই গ্রন্থি সঠিকভাবে কাজ করলে মানুষ সাধক প্রকৃতির হয়ে ওঠে এবং দৈবগুণসম্পন্ন হয়। এদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে।

ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও বিচার শক্তির নিয়ন্ত্রক গ্রন্থি হওয়ায় পিটুইটারী গ্রন্থির সমস্যার জন্য দুর্বল ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতির সমস্যা ও বিচারবোধ-এ ঘাটতি দেখা দেয় মানুষের মধ্যে। এই গ্রন্থি দেহের বৃদ্ধিকে পরিচালনা করে বলে এর নিষ্ক্রিয়তা থেকে বামনত্বের আশংকা থাকে, এবং একইভাবে এর অতি সক্রিয়তার ফলে দেহের আকৃতিতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে।

৫. অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কাজ কি?

গ্রন্থিসমূহ	কাজ
পিটুইটারি (বিন্দু নং-৩)	বায়ু ও আকাশের নিয়ন্ত্রক। এটি সব গ্রন্থির মধ্যে রাজার মতো; দেহে বৃদ্ধি, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।
পিনিয়াল (বিন্দু নং-৪)	শরীরে জলের নিয়ন্ত্রক, সকল গ্রন্থির পরিচালক, মস্তিস্ক-মেরু জলের ও যৌন কামনার নিয়ন্ত্রণ করে। স্নায়ুর বৃদ্ধিতে সহায়ক।
থায়রয়েড ও প্যারাথায়রয়েড (বিন্দু নং-৮)	বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে; ফলে ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের তাপমাত্রার তারতম্য নিয়ন্ত্রণ করে; ক্যালসিয়াম নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন পরিচালনা করে।
যৌন গ্রন্থিমালা/ গোনাড্স (বিন্দু নং-১১ থেকে ১৫)	জল ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে; যৌন হরমোন উৎপাদন করে।
এড্রিনাল ও প্যানক্রিয়াস (বিন্দু নং-২৮ ও ২৫)	অগ্নি ও পাচক রসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ত ও শর্করার মাত্রার নিয়ামক; মানসিক চাপ, সক্রিয়তা ও চরিত্র নির্মাণের নিয়ন্ত্রক; সোডিয়াম ও জলের ভারসাম্য বজায় রাখে।
নাভিচক্র (বিন্দু নং-২৯)	অপান বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে মল ও মূত্রের চলাচল বজায় রাখে; মধ্যচ্ছদার নীচে অবস্থিত সকল অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে।
থাইমাস (বিন্দু নং-৩৮)	শিশু বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া (১২ থেকে ১৫ বছর বয়স) পর্যন্ত মায়ের মতো লালন করে।

৬. অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলো ঠিকমতো কাজ না করলে কি ঘটে?

গ্রন্থির নাম	বিকার অবস্থায় ফল
১. পিটুইটারী গ্রন্থি (বিন্দু-৩): সমস্ত গ্রন্থির রাজা। এটি দেহের সমস্ত গ্রন্থিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মস্তিষ্ক ও দেহের বৃদ্ধিকে চালনা করে।	১. দেহের বামনত্ব ও স্ফীত দেহ এবং জড়বুদ্ধি হবার ভয়। শিশু গুন্ডা প্রকৃতির, অবাধ্য ও মিথ্যাবাদী হয়ে যায়।
২. পিনিয়্যাল গ্রন্থি (বিন্দু-৪) যৌন জীবন ও শরীরের জল নিয়ন্ত্রণ করে, এটি দেহের আদি চক্ষু।	২. অকালে যৌনতার বিকাশ, জলের মাত্রা বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ।
৩.থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (বিন্দু ৮) এই গ্রন্থি শরীরে ক্যালসিয়ামের হজম শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহের বৃদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।	৩. প্রয়োজনের চেয়ে কম কাজ করলে রিকেট ও ছটফটানি হয়, দাঁতের রোগ হয়। পেশিতে টান ধরে, স্থুলতা ও জড়তার উদ্রেক হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করলে অতিবৃদ্ধি, গলগন্ড, চোখ ঠেলে ওঠা, কিডনিতে পাথর প্রভৃতি হয়ে থাকে।
৪. যৌন গ্রন্থিমালা (বিন্দু-১১-১৫) শরীরের তাপ, আকর্ষণীয়তা ও জীবনের সৃজনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।	৭. প্রজননের অঙ্গগুলি নষ্ট হয়ে যায়, মাসিকের গন্ডগোল দেখা দেয়, স্বমৈথুনের অভ্যাস হয়, শরীরের তাপ কমে যায় ফলে স্থুলতা, দেহে আকর্ষণীয় ভাবের অভাব এবং যৌন শীতলতা বা অতিরিক্ত কামনা প্রভৃতি সমস্যাগুলো দেখা দেয়।
৫. অগ্ন্যাশয় (বিন্দু-২৫) শরীরে চিনির হজমকে নিয়ন্ত্রণ করে।	৫. প্রয়োজনের চেয়ে কম কাজ করলে জড়তা, ভীরুতা, শক্তিহীনতা ও অক্সিজেনেশনের অভাব প্রভৃতি হয়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কাজ করলে রক্তে উচ্চ চাপ (high B.P.) মাইগ্রেন ও অতিরিক্ত পিত্ত হয়, যার ফলে অ্যাসিডিটি (acidity) বমি ও প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়।
৬. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (বিন্দু-২৮) পিত্তসৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে, যকৃৎ ও রক্তের প্রবাহ, রক্তের চাপ (ব্লাড প্রেশার) নিয়ন্ত্রণ করে, চরিত্র গঠন করে।	৬. এই গ্রন্থিগুলো যথেষ্ট কাজ না করলে মধুমেহ হতে পারে। প্রয়োজনের বেশি কাজ করলে রক্তচাপ কমে যাওয়া (Low B.P.), মাথা ঝিম ঝিম করা এবং এমন কি পানদোষও হতে পারে।
৭. থাইমাস গ্রন্থি (বিন্দু-৩৮) শিশুকে ১৫ বছর পর্যন্ত রক্ষা করে।	১. শিশু অসুস্থ হয়, ১৫ বছরের পর সক্রিয় হলে শিশু জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

পরিচ্ছেদ-৭

রোগভেদে বিন্দুর শ্রেণী বিন্যাস

সমস্যা	জরুরি বিন্দু	প্রয়োজনীয় বিন্দু	সহায়ক বিন্দু
উচ্চ রক্তচাপ	৪, ২৮	২, ৫, নার্ভাল পয়েন্টস্	৩, ১৬
এসিডিটি, আলসার	১৯, ২২, ২৩, ২৮	২৭	৮, ২৫, ২৯
এ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিস	৬, ৮, ৩০, ৩৪	১, ২, ৩, ৪	২৮, ১৬; ৩৮ (শিশুদের ক্ষেত্রে)
এলার্জি/ চর্ম রোগ	২১ এর উল্টো দিক	২৩, ৩৭	২৬
কান	৩১, ৩৩	৩	৩৫, ১৬
কিডনী সমস্যা	২৬, ১১, ১৮, ৪	৮, ২৩, ৩৭, ২৮	৩, ১৬, ২৭, ১৯, ২২
কাঁধ ব্যথা	২৪	৭, ৮;	৩, ১১, ২৮
কোমর ব্যথা	৯	১৭, ১১-১৫, ফুট রোলার	৩, ২৮, সাইটিকা
কোষ্ঠবদ্ধতা পাইলস্ / অর্শ	৮, ১০, ২০	২৭, ২৩, ২৮	১৯, ২২, ২৫
ক্লান্তি, অবসাদ	৩২	২৩, ২৮, NP, SP	৩, ১৬, ২৫ সাথে ফুট রোলার
গলা	৬	৩০, ৮, ৩৪	১৬, ২৮
গাউট/ গেঁটে বাত	৮, ৯, ১৯	১৭, ২৩, ২৮, ২৭	২২, ২৫
চোখ	৩৫	২৩, ২৮	৩১, সাইনাস
জন্ডিস	২৩, ২৮, ৩৭	১৯, ২৭	৮, ১৬, ২২, ২৫, ২০
ডায়াবেটিস	২৫, ২৮, ১৬	২৩, ২৭	৩, ৪
থাইরয়েড	৮	৩, ৪	১১-১৫, ২৫, ২৮
দাঁতের সমস্যা	ব্যথা আক্রান্ত দাঁতের সংশ্লিষ্ট আঙ্গুলের ডগা অর্থাৎ সাইনাস বিন্দু (১২৪ নং চিত্র অনুযায়ী)	২৩	M F

সমস্যা	জরুরি বিন্দু	প্রয়োজনীয় বিন্দু	সহায়ক বিন্দু
নিম্ন রক্তচাপ	২৫	২৮, ২৩	১৬, ২৭
প্রোস্টেট/ প্রস্রাব	১১, ১৮, ২৬	২৩, ২৮, ২৭, ১০	৮, ৩৭, ২০।
ব্রেষ্ট সিস্ট/ টিউমার	L B, R B	১১-১৬	৩, ৪, ২৩, ২৫, ২৮
মলাশয় (কোলন)	২০	১০, ২৭, ১৯	২৩, ২৫, ২৮
মাথা ব্যথা, মাথা ধরা (মাইগ্রেন)	১ থেকে ৫	২৫, ২৭ ও ২৮	২৩, ১০, ২০, ৩১ ও ৩৫ (প্রয়োজনে), ৩৪ (ঠান্ডায় ভুগলে)
মানসিক উদ্বেগ/ দুঃশ্চিতা/ অনিদ্রা	M F	২৩, N P	৩, ৪, সাইটিকা
মাসিকের সমস্যা	১২, ১৩, ১৪	১১, ২৮, ২৩, ১০, ২০	১৬, ২৮
যৌন সমস্যা	১১ হতে ১৫	৮, ২৩	৩, ৪
রক্তস্বল্পতা, কোলেষ্টেরল, থেলাসেমিয়া	৮, ২৩, ৩৭	২৮, ২৭, ১০, ২০, ৩৬	৩, ১৬, ২৫
লিভার	২৩	২৮, ২২	২৭
সর্দি, কাশি ও ঠান্ডা	৩০, ৩৪, ২৭	৮, ১, ৪	২৮, ১৬, ৩
সাইনোসাইটিস	সাইনাস, ৩০, ৩৪	৮, ১, ৪	১৬, ২৮
স্পন্ডিলাইটিস/ ঘাড় ধরা ঘাড় ব্যথা/ থাইরয়েড	৭, ৮	৯, ২৪	৩, ২৮
হজম, গ্যাস, ক্ষুধামন্দা	২৭	২৮	২৩, ১৯, ২২
হাঁটু ও নিতম্ব ব্যথা	১৭	৯, ফুট রোলার, সায়টিকা	৩, ২৮, ১৬
হৃৎপিন্ড	৩৬	৮	৩, ১৬

দাঁতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আঙ্গুলের ডগা

(সাইনাস বিন্দুসমূহ)
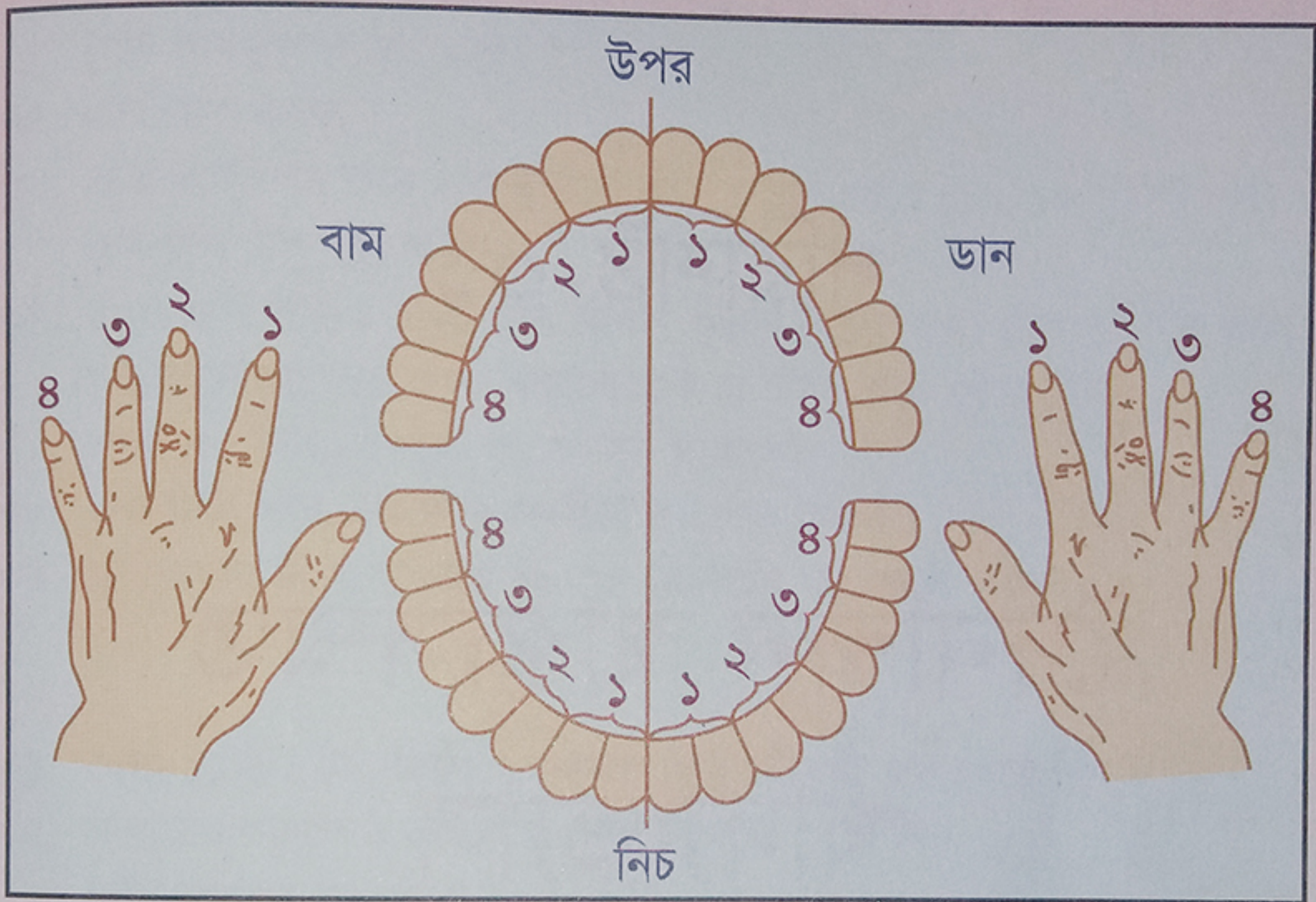
(চিত্র - ১২৪)

পরিশিষ্ট-০১

দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস

সকাল ঃ

০১. ঘুম ভাঙ্গার পরে খালি পেটে নাভিচক্র ঠিক করুন। (চিত্র-২২)
০২. বাসি মুখে, খালি পেটে দু'গ্লাস সহনীয় গরম পানি পান করুন।
০৩. এরপর অ্যাকিউপ্রেশার করে নিন। পায়ে না হলেও দু'হাতে অবশ্যই।
০৪. খুব বেশি পাকা নয় এমন একটি টমেটো খেয়ে নিন।
(যদি বিষমুক্ত পাওয়া যায়)
০৫. প্রাত:রাশ করুন।
০৬. প্রাত:রাশ শেষ করে এক টুকরো কাঁচা পেঁপে খেয়ে (১০-১৫ মিনিট পর) এক গ্লাস জল পান করুন।
০৭. ১০০ গ্রাম ধনে ও ১০০ গ্রাম জিরার গুঁড়ার মিশ্রণ আধা গ্লাস পানিতে গুলে সকালে নাস্তার পর এবং বিকালে এক চা চামচ করে খেয়ে নিন। প্রথম ৪০ দিন (হৃদরোগের সমস্যা থাকলে)
০৮. এক ঘন্টা পরে এক কাপ সবজির রস পান করুন।
০৯. ফুটরোলার দিয়ে দু'পায়ে ১০-১৫ মিনিটের মত রোল করুন।

দুপুর ঃ

০১. বেলা ১১-১২ টার দিকে পছন্দমত কিছু মৌসুমী ফল খেয়ে নিন।
০২. খাবারের শুরুতে একটি অল্প পাকা টমেটো খেয়ে নিন
(যদি বিষমুক্ত পাওয়া যায়)।
০৩. দুপুরের খাবার শেষে এক টুকরো কাঁচা পেঁপে খেয়ে (১৫-২০ মিনিট পর) জল পান করুন।
০৪. ১ ঘন্টা পরে দু'হাতে আকুপ্রেশার করে নিন।

বিকাল ঃ

০১. বিভিন্ন কাঁচা শাক ও সবজি ব্লেন্ড করে এক কাপ সবজির রস পান করুন।

রাত ঃ

০১. ৮টা বাজার আগে রাতের খাবার খেয়ে এক টুকরো কাঁচা পেঁপে খান।
০২. ঘুমানোর আগে গরম জল, কাঁচা সবজি বা ফলের রস খাবেন।
০৩. ঘুমানোর আগে একটি অল্প পাকা টমেটো খেয়ে নিন।
(যদি বিষ মুক্ত পাওয়া যায়)
০৪. হাত এবং পায়ের সবক'টি পয়েন্টে আকুপ্রেশার করে ঘুমাতে যাবেন।
০৫. শোয়ার আগে মিনিট দশেক ফুটরোলার করুন।

এর বাইরে নিজের সুবিধা ও সময়মত অবশ্যই আরও কয়টি নিয়ম মানার চেষ্টা করবেন -

০১. সারাদিনে সুযোগ করে পর্যাপ্ত সহনীয় গরম জল পান করুন।
০২. সপ্তাহে একদিন ঈষদুষ্ণ জল, সবজি বা ফলের জুস ছাড়া ভারী খাবার খাবেন না।
০৩. ঠান্ডা খাবার ও ঠান্ডা পানীয় খাওয়া ছেড়ে দিন।
০৪. খাবার সময় কথা বলবেন না।
০৫. যেকোন খাবার খুব ভালভাবে চিবিয়ে খাবেন অর্থাৎ চিবিয়ে রস না হওয়া পর্যন্ত গিলবেন না কোন কিছুই।
০৬. ফাস্ট ফুডসহ ভাজা খাবার খুব বেশি খাবেন না। কোক-ফানটা জাতীয় যেকোন পানীয় ছেড়ে দিন।
০৭. খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কাঁচা মরিচ চিবিয়ে খাবেন।
০৮. দিনে দু'বার ১৫ মিনিট হাত পা রোলার দিয়ে রোল করুন।

যাদের কিডনি অথবা প্রস্রাবজনিত সমস্যা আছে তারা সকালে গরম জলের পরিবর্তে দু'সপ্তাহ কালো চা পান করুন।

কালো চা তৈরির নিয়ম

এক কাপ জলে এক চা চামচ চা পাতা দিয়ে ফুটিয়ে অর্ধেক করুন। এই অর্ধেক কাপ চায়ের সাথে সাধারণ জল মিশিয়ে এক কাপ করে দুধ বা চিনি ছাড়া পান করুন। ফ্রিজের জল মিশাবেন না।

সবজির রস তৈরির নিয়ম

লাল শাক, পুঁই শাক, কচু শাক ছাড়া সকল শাক-সবজি ব্লেন্ডারে দিয়ে ১/ ২ গ্লাস জল মিশিয়ে ব্লেন্ড করে খাবেন। অবশ্যই শাকের পরিমান ৭০ ভাগ এবং সবজির পরিমান ৩০ ভাগ হবে (কাঁচা শাক পাতা ও সবজি রস করার আগে ঘন্টা খানেক সময় কুসুম গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন বিষমুক্ত করার জন্য)। এর সাথে এক চা চামচ করে মধু (ডায়াবেটিস না থাকলে) ও স্বাস্থ্যচূর্ণ (১:৩ পরিমাণে আদা ও আমলকি গুড়ার মিশ্রণ) মিশিয়ে নিন।

পরিশিষ্ট-০২

আকুপ্রেশার প্রয়োগের নিয়ম-সংক্ষেপ

আকুপ্রেশার করার নিয়ম

০১. প্রথম তিন দিন ব্যথার পয়েন্টে ৫০ বার চাপ দিতে হবে।

০২. দিনে তিন বার সকালে, দুপুরে এবং রাতে পায়ের প্রতিটি বিন্দুতে একটু বেশি সময় ধরে অর্থাৎ ১০০ -১৫০ বার চাপ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু কখনোই হাতের কোন বিন্দুতে সময়ের হিসাবে দুই মিনিটের বেশি চাপ দেয়া উচিত না।

০৩. একনাগাড়ে চাপ দিবেন না। থেমে থেমে পাম্প করার মত করে চাপ দিতে হবে।

০৪. প্রতিটি বিন্দুর উপর এবং তার চারপাশে চাপ দিতে হবে। এজন্য বিশেষ কোন সময়ের প্রয়োজন নেই।

০৫. সুবিধামত অবস্থাতেই (বসে, শুয়ে বা চলা অবস্থায়) এই চিকিৎসা চালানো যেতে পারে।

০৬. খাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে এই চিকিৎসাটা না করাই ভাল।

০৭. তাড়াতাড়ি সেরে যাবে এই ভেবে অনেকে বিন্দুগুলোতে অনেকক্ষণ ধরে চাপ দিয়ে থাকেন। অথবা দিনের মধ্যে অনেকবার চাপ দেন। তা ঠিক নয়। এর ফলে দেহের সুইচগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

০৮. এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই সহজ ও সরল। এমনকি ১০ বছরের শিশুও শিখে তা প্রয়োগ করতে পারে। এতে আনুমানিক উপসর্গের কোনও ভয় নেই।

০৯. ২৬ নং বিন্দুতে সবার শেষে চাপ দিবেন।

০৮. দিনে দু'বার ১৫ মিনিট হাত পা রোলার দিয়ে রোল করুন।

০৯. এই চিকিৎসা শুরু করার প্রথম ৪০ দিন ছোট মাছ ও মুরগীর মাংস খাওয়া যাবে। তাও সপ্তাহে ২/১ দিন কেবল দুপুরে চিবিয়ে রস করে খাবেন। বড় মাছ ও অন্যান্য মাংস খাওয়া যাবে না।

১০. প্রথম ৪০ দিন দুপুরে ও রাতে চামচ দিয়ে খাবেন।

১১. পায়খানার সময় থুতনিতে চাপ দিন। এ সময় অন্য চিন্তা পরিহার করুন।

পরিশিষ্ট-০৩

পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি

পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি - ১

* জীবাণু আক্রমণ-সংক্রমণ ঘটনা ছাড়া রোগ উৎপত্তির তিন কারণ–

খাদ্য–পাপ !

চিন্তা–পাপ !

ঔষধ–পাপ !

পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি - ২

* মানুষের দেহের রোগব্যাধির মূল নিহিত–

তার মনে অর্থাৎ চিন্তা প্রবাহে,

মনের সমস্যার মূলে কাজ করে তার দৃষ্টিভঙ্গি

আর দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যার মূল হচ্ছে অধর্ম তথা প্রকৃতি বিরুদ্ধতা।

পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি - ৩

১. নিয়মিত আকুপ্রেশার অনুশীলনকারী ব্যক্তি ও পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় নেমে আসে শূণ্যের কোঠায়।

২. Doctor, Drug, Diagnosis এই তিন 'D' -এর দ্বারস্থ হতে হয় না এরূপ ব্যক্তি ও পরিবারকে।

৩. ভেজাল খাদ্য বা জীবাণুতে আক্রান্ত হলেও তা রোগ হিসেবে প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করে প্রতিরোধ করা যায়।

পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি - ৪

➤ কেবল-

শর্ত-০১ : কথা না বলে (অন্তত মুখে খাবার রেখে)

শর্ত-০২ : প্রফুল্ল চিত্তে

শর্ত-০৩ : ধীরে-সুস্থে

শর্ত-০৪ : ভালোভাবে চিবিয়ে

শর্ত-০৫ : রস করে

খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হলে. . . . .

নিশ্চয়তা ১ ঃ

যিনি যে রোগে ভুগছেন তার রোগ অর্ধেক ভাল হয়ে যাবে।

নিশ্চয়তা ২ ঃ

যার ডায়াবেটিস হয়নি তার এ জীবনে হবে না নিশ্চিত,
যার হয়েছে তারও ভাল হয়ে যাবে।

নিশ্চয়তা ৩ ঃ

যার ক্যান্সার হয়নি তার এ জীবনে ক্যান্সার হবে না নিশ্চিত।

নিশ্চয়তা ৪ ঃ

যার পেটের পীড়া রয়েছে তার পেটের পীড়া ভাল হয়ে যাবে,
যার নেই তার কখনো হবে না।

নিশ্চয়তা ৫ ঃ

প্রতিটি মানুষের খাদ্যের চাহিদা কমে আসে অর্ধেকে,
এমন কি এক -তৃতীয়াংশে;
অথচ এ অবস্থায় শারীরিক শক্তি বেড়ে যায় দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ।

পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি - ৫

আকুপ্রেশার নিয়মিত গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বভাব প্রকৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে লক্ষ্যণীয় মাত্রায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আপনার স্বাস্থ্য আপনারই হাতে -শ্রী দেবেন্দ্র ভোরা।

২. আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে -ডা. টি ভট্টাচার্য।

৩. মডার্ন এলোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট -ডা. পশুপতি চট্টোপাধ্যায়,
ডা. শীল,
ডা. পাল।

৪. হ্যান্ডবুক অব এনাটমি এন্ড ফিজিওলজী -অধ্যাপক ডা. এ,কে, চাকলাদার।

৫. দৈনন্দিন রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা -শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

৬. পুরাতন রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা -শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

৭. স্ত্রী রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা -শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

৮. খাদ্যের নব বিধান -শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

৯. প্রাকটিস অব মেডিসিন হোমিওপ্যাথিক -ডা. এ,কে, চাকলাদার।

১০. আকুপাংচার -ডা. ভবানী প্রসাদ সাহু।

11. Health in your Hands - Devendra Vora.

12. The Reflxology Manual - Paulene Wills.

13. Anatomical Atlas of Chinese Acupressure Points -Chen Jing.

14. The Pictorial Atlas of Acupunture -Yu-Lin Lian,
Chun-Yan Chen,
Michael Hammes,
Bernard C. Kolster.

* 'জৈব-বিদ্যুৎ ভিত্তিক সব রকমের চিকিৎসাই বিশ্বে জনপ্রিয় হবে। এই সবকটি চিকিৎসার মধ্যে আকুপ্রেশার হলো সবচেয়ে সহজ, সরল এবং সেরা "নিজে-কর" চিকিৎসা। শুধু এই চিকিৎসাতেই রোগ প্রতিরোধ হয়, সঠিক রোগ নির্ণয় হয় এবং সব রকমের অসুখ নিরাময় হয়। যতদিন মানব সমাজ থাকবে, এটিই হবে বিশ্বের সেরা চিকিৎসা।'

-ডা. জুলিয়ান এন. কেনিয়ন, এম.ডি বৃটেন।

(টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি মেডিসিন গ্রন্থ থেকে)।

* 'আমাদের দেহের নিজের রোগ সারাবার দারুণ ক্ষমতা আছে।'

-ডা. এন্ড্রু ওইল, এম.ডি, আমেরিকা

(স্পন্টেনিয়াস হিলিং গ্রন্থ থেকে)।

* 'আমাদের দেহের মধ্যেই অবস্থিত প্রকৃতির নিজস্ব বিজ্ঞান থেকে আকুপ্রেশারের জন্ম। এই চিকিৎসা মনুষ্য জাতির এক মহা সম্পদ। যেমন রোদ, বাতাস ও জল প্রকৃতির অবাধ দান, এই বিজ্ঞানও সেইরকম। এমনকি শিশুও এই পদ্ধতি বুঝতে পারে, অনুশীলনও করতে পারে। যে কোন ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য এই চিকিৎসা নিজেই চালাতে পারেন।'

-সাধক শ্রী দেবেন্দ্র ভোরা

(আপনার স্বাস্থ্য আপনারই হাতে গ্রন্থ থেকে)।

সফল চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক চিকিৎসকেরই চিকিৎসা শাস্ত্রে তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি এর প্রয়োগ পদ্ধতি শিখতে হয়। এজন্য একজন এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক পড়েন *'Hutchison's Clinical Method'* হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পড়েন *'Hahnemann's Organon of Medicine'* এবং হাকিমগণ পড়েন *'কুলিয়াতে আদভিয়া'* বা *'উছুলে আদভিয়া'*।

তেমনি, একজন আকুপ্রেশার থেরাপিষ্টের জন্য এমনি একটি বই সাগর সগীর প্রণীত আকুপ্রেশারের উপর *'স্বচিকিৎসা প্রয়োগবিধি'*। সহজ ভাষায় অল্প কথায় লিখিত বইটি থেরাপিষ্ট ও রোগী উভয়ের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয়। আমি এর বহুল প্রচার কামনা করি।

ডাঃ শেখ ফারুখ এলাহী
এমবিবিএস, এমপিএইচ (ঢাবি), এমফিল (ঢাবি), এমসিপিএস (বিডি), এফসিজিপি, এফআরএসএইচ (লন্ডন), সিসিডি (বারডেম), ডিএমইউ, ডিএইচএমএস, এএমএফ হোম (লন্ডন), প্রাক্তন সদস্য, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ও বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ।